বন্ধন

BANDHAN

শারদীয় সংখ্যা ২০১৯

Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPCI) WA, Australia

Proudly supported by: lotterywest

Pharmacy 777 Nollamara
WE PROVIDE personalised care TO CREATE MEANINGFUL OUTCOMES FOR your health. OUR SERVICES INCLUDE:
Sleep apnoea screening, management and support
Diabetes management and NDSS supplies
Blood pressure checks
Asthma management
Pain management
Weight management
Mental health support
Private pharmacist consultations
Medication reviews
Parent's Group
Scripts Online and reminders for your prescriptions
Free every day Express Delivery in the local area
Mobility and home aids for hire
Medical certificates
Compounding
Medication packing (DAA)
Disposal of expired medications
Flu vaccinations
EVERY DAY 8AM - 10PM
Nollamara Shopping Centre,
84 Hillsborough Drv
Call 08 9349 1570
Email nollamara@pharmacy777.com.au
HERE FOR YOUR health, FOR life.
GUILD NATIONAL PHARMACY OF THE YEAR 2016
www.pharmacy777.com.au

AUSBANGLA
INDIAN GROCERY
FIRST BANGLADESHI SHOP IN WESTERN AUSTRALIA
A CONVENIENT SUB-CONTINENTAL RETAIL/WHOLESALE SHOP
NEW STORE @ MORLEY
Wide range of Bangladeshi, Indian, Pakistani, Sri Lankan and Oriental Foods, Spices, Fresh Water Fish, Sea Foods, Frozen Vegetables, Halal Meat, Fruit Juices etc.
Also available international phone cards and small range of traditional clothing and jewelleries
7.5% DISCOUNT FOR STUDENT WITH STUDENT ID (MINIMUM PURCHASE $50).
WE WILL BEAT ANY COMPETITORS PRICE BY 5% WITH VALID TAX INVOICE
We specialise in Burmese fish
BUSINESS HOURS: Mon - Sun 9.30am - 8.00pm, Thursday 9.30am - 8.30pm
CANNINGTON: Shop #4, 1468 Albany Highway (cnr Nicholson & Albany Hwy)
MORLEY: Shop 196a, 243/253 Walter Road (Opposite Centro Galleria)
MOB: 0402 460 677 • TEL: 9356 3746
FAX: 9356 3747 • EMAIL: ausbanglaenterprise@yahoo.com.au
OPEN 7 DAYS
PH: 08 9356 3746
OPEN 7 DAYS
Indian Gourmet Cannington
Home of Indian Groceries
Ausbangla Enterprise South
Ph: 9356 3746
Indian Gourmet Cannington
CASH 'N' CARRY
CANNINGTON BUTCHERS • FRESH FRUIT & VEGES

বন্ধন
BANDHAN

সংকলন ২০১৯, নবম সংখ্যা
Magazine 2019, Issue 9
আশ্বিন ১৪২৬,
October 2019

বন্ধন পরিষদ

প্রভাত রায়
শর্মিষ্ঠা সাহা
বিশ্বজিৎ বসু

Bandhan Committee

Provat Roy
Sharmistha Saha
Biswojit Bose

প্রচ্ছদ
প্রভাত রায়
Cover Design
Provat Roy

অক্ষর বিন্যাস
প্রভাত রায়
Page Makeup
Provat Roy

Acknowledgement

Gautam Sharma
Saumitra Seal
Jahar Chowdhury
Rupam Barua
Probir Sarker
Uttam Dewanjee
Uttam Debnath
Tanni Chowdhury
Partha Sarathi Deb

প্রকাশক:
দি বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার, অস্ট্রেলিয়া।

Publisher:
The Bangali Society for Puja and Culture (BSPC) Inc. WA, Australia.

বিঃদ্রঃ লেখকের মতামতের জন্য সম্পাদক বা প্রকাশক দায়ী নয়।

:: সম্পাদকীয় ::

"সর্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি নারায়নী নমস্তুতে"

বাঙালি হিন্দু ধর্মানুসারীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম "শারদীয় দুর্গা পূজা"। প্রতিবছর সনাতন ধর্ম অনুসারীরা মহাসমারহে এই পূজার আয়োজন করে চলেছে। বর্তমান সময়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালির প্রাণের উৎসবে পরিণত হয়েছে "শারদীয় দুর্গা পূজা"। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থবাসীরাও এর ব্যাতিক্রম নয়। নানারকম সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজ ধর্মীয় আচার আচরণ পালন, উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উৎযাপন, নতুন প্রজন্ম এবং সর্বোপরি সর্বসাধারণের নিকট "শারদীয় দুর্গা পূজা" উৎযাপনের মাহাত্ত প্রচারের নিমিত্তে "বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ইনক" (BSPCI) প্রতিবছর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতি বছর মায়ের পদতলে পুস্পাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে বিশ্ব সমাজের শান্তি ও চিরমঙ্গল কামনা করতে আমরা মিলিত হই এই দিনে। প্রায় এক দশকেরও বেশী সময় ধরে চলে আসা পূজা উৎযাপনের ধারাবাহিকতায় প্রতিবারের মত এবারও "বাঙালি সোসাইটি ফর পূজা এন্ড কালচার ইনক" (BSPCI) অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আয়োজন করেছে শারদীয় দুর্গাপূজার। মায়ের আগমন আমাদের যাবতীয় দুঃখ কষ্ট দূর করে সবার জীবনকে শান্তিময় ও কল্যানকর করবে- এটাই প্রার্থনা। প্রবাসী দূর্গোৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্বীয় জাতিসত্তাকে তুলে ধরার ধারাবহিকতায় এবারও প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ম্যাগাজিন "বন্ধন" যা বর্তমান কালের বাঙালি পার্থবাসীর এই উৎসব আয়োজনেরই একটি অবিচ্ছেদ্দ অংশ। "বন্ধন" প্রকাশনার এবারের আয়োজনের সংগে সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, কারিগরি সহায়ক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। তারা ভবিষ্যতেও এভাবেই বন্ধনের সাথে যুক্ত থাকবেন এই আশা রাখি। এবারের "বন্ধন" প্রকাশনা, উৎসবের বাড়তি মাত্রা যোগ করলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে। এছাড়া প্রকাশনার মত একটি জটিল কর্মযজ্ঞকে সহজতর করতে বটবৃক্ষের ন্যায় পাশে থাকার জন্য বন্ধন পরিষদকে এবং কারিগরি সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট সকলকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ BSPCI পরিবারের সকল সদস্যকে সবসময় সর্বাত্মক সহযোগীতার জন্য।

মা দুর্গার আশীর্বাদে জগতের সবার জীবন শান্তিপূর্ণ হোক। মা দুর্গার মহিষাসুর বধের মত আমরাও যেন আমাদের মনের অসুরকে বধ করতে সমর্থ হই।

"যা দেবী সর্ব ভুতেশু শক্তিরুপেণ সংস্থিতা
নমস্তশৈ নমস্তশৈ নমস্তশৈ নমো নমঃ ।।
যা দেবী সর্ব ভুতেশু মাতৃরুপেণ সংস্থিতা
নমস্তশৈ নমস্তশৈ নমস্তশৈ নমো নমঃ ।।"

- ডাঃ প্রভাত রায়, সম্পাদক

The Bangali Society for Puja and Culture Inc. (BSPC), WA

Executive Committee 2019-2020

President	**:** Biswojit Bose
General Secretary	**:** Partha Sharathi Deb
Assist General Secretary	**:** Rupam Barua
Treasurer	**:** Uttam Dewanjee
Publication Secretary	**:** Provat Roy
Cultural Secretary	**:** Sangita Saha
Assist. Cultural Secretary	: Saptahrshi Seal
Religious Secretary	: Gargee Sarker
Members	: Gautam Sharma
	: Prabir Sarker
	: Chanchala Rani Das
	: Utpal Bhattacharjee
	: Tanmoy Debnath

সূচীপত্র

১. বিদ্যাসাগর - বিশ্বজিৎ বসু পৃষ্ঠা ২
২. অর্চনা - বাপ্পী রায় পৃষ্ঠা ৪
৩. ভিন্ন চোখে রামায়ণের নারীগণ - শর্মিষ্ঠা সাহা পৃষ্ঠা ৫
৪. মিনিগল্প `সম্পর্ক`- কমলেশ রায় পৃষ্ঠা ৬
৫. গীতি নৃত্যনাট্য- হৈচৈ এর বাগানে -সুস্মিতা সাহা পৃষ্ঠা ৭
৬. আমার স্মৃতি তে দাদাবাড়ি – মান্দারী - ডাঃ সুরঞ্জনা জেনিফার রহমান পৃষ্ঠা ৯
৭. কাশ ফুলের খোঁজে - অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায় পৃষ্ঠা ১০
৮. ৯ই ফাল্গুন এবং বাংলা - ডা: প্রভাত রায় পৃষ্ঠা ১০
৯. বিশ বছর চলে গেছে - ওয়াহিদ ইবনে রেজা পৃষ্ঠা ১১
১০. দুটি কবিতা - জোবায়ের স্বপন পৃষ্ঠা ১১
১১. Cancer > Love - Adiba Faruque পৃষ্ঠা ১২
১২. শারদীয়া - আমেনা বেগম ছোটন পৃষ্ঠা ১২
১৩. প্রকৃতি হন্তারক মানুষ - শহিদুল ইসলাম পৃষ্ঠা ১৩
১৪. Drawing by: Srija পৃষ্ঠা ১৪
১৫. ভগবান কোথায় থাকেন? - তন্ময় দেব নাথ পৃষ্ঠা ১৫
১৬. খন্ডচিন্তা - স্বর্ণা আফসার পৃষ্ঠা ১৬
১৭. কোন এক বঙ্গদেশের কথা তোমায় শোনাই শোনো, রূপকথা নয় সে নয় - আজিজ ইসলাম পৃষ্ঠা ১৮
১৮. Drawing by: Nimisha পৃষ্ঠা ১৯
১৯. Thammi’s arrival in Perth - Aaron Saha পৃষ্ঠা ২০
২০. Drawing by: Aaron Saha পৃষ্ঠা ২০
২১. The Creation of Maa Durga - Promiti Sarker পৃষ্ঠা ২০
২২. Sketch by - Promiti Sarker পৃষ্ঠা ২০
২৩. Hanging on by threads - Prithul Bisshay পৃষ্ঠা ২১
২৪. Digital Art by: Prithul Bisshay পৃষ্ঠা ২৩
২৫. Rainbow Sparkle - Elora Galib পৃষ্ঠা ২৩
২৬. Drawing by: Joyoti Sarker পৃষ্ঠা ২৪
২৭. Belinda The Little Girl - Joyoti Sarker পৃষ্ঠা ২৪
২৮. Western Australia’s Diverse Cultural Identity - Dr Rita Afsar পৃষ্ঠা ২৫
২৯. Drawing by: Dibbo পৃষ্ঠা ২৬
৩০. দুটি গীতিকবিতা - তপন বাগচী পৃষ্ঠা ২৭
৩১. বিবর্ণ পরিচয় - কাজী মোহাম্মদ ইমামুল হক পৃষ্ঠা ২৭

বিদ্যাসাগর

-বিশ্বজিৎ বসু

জন্ম সুত্রে তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। নিজ কর্মগুণে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সময়ের পরিক্রমায় আজ তিনি শুধুই বিদ্যাসাগর।

প্রাচীন বাংলায় বিদ্যাসাগর একটি উপাধি। প্রাচীন ভারতীয় টোল শিক্ষাপদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য এরকম আরো কিছু উপাধি ছিল। তরর্কালংকার, ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন এরকম কয়েকটি উপাধি। সে সময়ে অনেক বিদ্যাসাগর উপাধিধারী জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে ছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষ বিদ্যাসাগর বলতে শুধু একজনকেই জানে। আর এই পরিচয়ের পিছনে রয়েছে তাঁর একান্ত পরিশ্রম, মানব প্রেম, করুণা, জ্ঞান এবং বীর্য। তিনি আজ প্রবাদ পুরুষ। বাংলার ঘরে ঘরে প্রবাদে পরিণত হয়েছে তাঁর জীবন কথা।

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম ১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁর মায়ের নাম ভগবতী দেবী আর বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। তিনি ছিলেন পরিবারের প্রথম সন্তান। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন ভ্রমণ বিলাসী এক যোগী পুরুষ। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। ভ্রমণকালীন সময়ে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন তাঁর বংশে এক অদ্ভুতকর্মা মহাপুরুষের জন্ম হবে।

স্বপ্নতাড়িত হয়ে তিনি বাড়িতে ফিরে আসেন। এসে দেখেন পুত্রবধূ অন্তঃসত্ত্বা এবং পাগলপ্রায়। নাতির জন্মগ্রহণ পর্যন্ত তিনি বাড়িতেই অবস্থান করেন। জন্মের পরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের জিহ্বার নিচে আলতা দিয়ে কিছু লিখে দেন এবং বলেন "এ শিশু উত্তরকালে সকলকে পরাজয় করিবে, ইহার প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারদিক প্রকম্পিত হইবে, ইহার দয়াদাক্ষিণ্যে সকলে মুগ্ধ হইবে।"

পাঁচ বছর বয়সে শুরু হয় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা। ভর্তি হন গ্রামের কালিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। ১৮২৮ সালে বাবার সংগে তিনি প্রথম কোলকাতা আসেন। তাঁর প্রথমবার কোলকাতা আসা নিয়ে কিংবদন্তি গল্প এখন বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। কোলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হন শিবচরণ মল্লিকের বাড়িতে স্থাপিত স্বরূপচন্দ্র দাসের পাঠশালায়। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিন মাসের মধ্যে তাঁকে ফিরে যেতে হয় গ্রামে ।

পাচঁ মাস পর পুনরায় কোলকাতা ফিরে আসেন এবং ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। এ বছরটি সনাতন হিন্দু সমাজের জন্য একটি স্মরণীয় বছর। এবছর ডিসেম্বর মাসে সহমরণ-সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়। উল্লেখ্য যে রাজা রামমোহন রায় যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স মাত্র ১৩ বছর। ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম সনও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পকলার ইতিহাসে মাইল ফলক। সেই বছরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সংস্কৃত কলেজ।

কোলকাতা অবস্থান করবার জন্য তখন সংস্কৃত কলেজ হতে বৃত্তি দেয়া হতো। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্তি হবার দেড় বছর পর মাসিক পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। তিনি সাড়ে তিন বছর ব্যাকরণ শ্রেণীতে পড়েন এবং প্রতিবছরই তিনি বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ব্যাকরণ শিক্ষার পাশাপাশি তাঁর ঐচ্ছিক বিষয় ছিল ইংরেজি। ইংরেজিতে বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্যও তিনি পর পর দুবার বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালের নভেম্বরে সংস্কৃত কলেজ ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ বছরই কোলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে শুরু হয় এলোপ্যাথি চিকিৎসার যুগ ।

বিদ্যাসাগর এরপর জয়গোপাল তর্কলঙ্কারের নিকট দুই বছর সাহিত্য শ্রেণীতে, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির নিকট বেদান্ত শ্রেণীতে দুই বছর পড়াশোনা করেন। এরপর ভর্তি হন স্মৃতি শ্রেণীতে। বেদান্ত শ্রেণীতে পড়ার সময়ে তাঁর মাসিক বৃত্তি ৫ টাকা হতে ৮ টাকায় বৃদ্ধি পায়। সাহিত্য এবং বেদান্ত দুই শ্রেণীতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। স্মৃতিশাস্ত্র পড়ার সময়েও তাঁর ৮ টাকা বৃত্তি অব্যাহত ছিল । ১৮৩৯ সালে স্মৃতিশাস্ত্রের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় তিনি ৮০ টাকা এবং সংস্কৃত গদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা পুরস্কার পান।

এবছরই তিনি হিন্দু আইন কমিটির কমিটির পরীক্ষা দেন। আদালতে জজ-পণ্ডিত নিযুক্ত হবার জন্য এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতো। ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং সেই সংগে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হন। বিদ্যাসাগর উপাধিধারীদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে কম বয়সে এ উপাধি লাভ করেন।

ইংরেজিতে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর উপাধির সনদপত্রে লেখা হয়েছিল--

"This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the seal of the Committee sixteenth day in May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Jaistha 1761 Sak."
- J. C. C SUTHERLAND. secy. to the Committee.

এবছরেই তিনি ন্যায় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। মে মাসে সংস্কৃত কলেজের সকল বিভাগের ছাত্রেরা কলেজে ইংরেজি বিভাগ পুনরায় চালু করার জন্য ততকালীন সেক্রেটারি জি. টি মার্শেলের নিকট আবেদন করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি তুলে দেয়া হলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজি চালু ছিল। এসময়ে তিনি ভুগোল ও মহাকাশ বিষয়ে কতগুলি শ্লোক লিখেন এবং পুরস্কার পান।

১৮৪১ সালে ন্যায়শাস্ত্র পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এজন্য তিনি ১০০ টাকা পুরস্কার পান। এছাড়া এবছর তিনি পদ্য রচনার জন্য ১০০ টাকা, দেবনাগরী হাতের লেখার জন্য ৮ টাকা, বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন নিরীক্ষণ করার জন্য ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

১২ বছর ৫ মাস সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করার পর ১৮৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রশংসা পত্র লাভ করেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত এবং অধ্যাপকবৃন্দের সম্মিলিত স্বাক্ষরে তাকে প্রশংসাপত্র দেয়া হয়। ডিসেম্বর মাসেই তিনি ৫০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিত হিসাবে যোগদান করেন। ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আত্মীয়ের অসুস্থতার কারণে উপস্থিত হতে পারবেন না জানিয়ে কলেজের প্রধানকে বাংলায় চিঠি লিখেন। এই চিঠিটিই দাপ্তরিক কাজে লেখা বাংলা ভাষায় প্রথম চিঠি। যদিও ১৭০০ শতাব্দীতে

রাজকার্যে ব্যবহৃত রাজা নন্দকুমারের লেখা বাংলা গদ্যে চিঠি গবেষকরা উদ্ধার করেছেন। রাজা নন্দকুমার কে মিথ্যা অজুহাতে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেয় কোম্পানি ম্যাজিস্ট্রেট। সিরাজদৌল্যার পর তাঁর মৃত্যুদন্ডের মধ্যদিয়ে কোম্পানি শাসন আরো পাকাপোক্ত হয়।

দেশীয় লোকদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৪৪ সালে অক্টোবর মাসে হেনরি হার্ডিঞ্জ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে ১০১ টি পল্লী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এসব পাঠশালার শিক্ষক নির্বাচন করতেন বিদ্যাসাগর এবং মার্শাল সাহেব।

১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান করেন। ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর গদ্য গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর হিন্দি ভাষায় রচিত বৈতালপচিসী গ্রন্থ হতে এটি বাংলায় অনুবাদ করনে। বেতালপচিসী মুলত সংস্কৃত ভাষায় সোমদেব রচিত "কথাসরিতসাগর" এর বেতাল পঞ্চবিংশতিকা হতে অনূদিত। বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের মতে বেতালপঞ্চবিংশতি তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হলেও তার আগে তিনি " বাসুদেব চরিত," নামে একখানা গ্রন্থ লিখেছিলেন। সেটা মুদ্রিত হয়নি।

এ বছরেই রসময় দত্তের সাথে মতান্তর হওয়ায় তিনি সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন। দুই বছর পর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ট্রেজারার ও হেড রাইটার পরে যোগদান করেন। এসময়ে জে,ই,ডি বেথুন এবং তিনি কোলকাতায় নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটান এবং প্রতিষ্ঠা করেন "বেথুন নারী বিদ্যালয়"। নারী শিক্ষার প্রসারে তাকে সহযোগিতা করেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপ্যাধ্যায়, মদন মোহন তর্কলংকার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাম গোপাল ঘোষ প্রমুখ । বিদ্যাসাগর ছিলেন বিদ্যালয়টির সম্পাদক। মদন মোহন তর্কলঙ্কার তাঁর দুই মেয়ে ভুবনমালা এবং কুন্দমালাকে সর্বাগ্রে বিদ্যালয়ে পাঠান। সে হিসাবে বাংলায় প্রথম স্কুলগামী ছাত্রী এরা দুই বোন।

বেথুন নারী বিদ্যালয়ের নিজস্ব গাড়িতে বালিকারা পড়তে আসত এবং সে গাড়িটির গায়ে লেখা ছিল "কন্যাপেবং রাসলীলা শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ"।

এসময়ে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কলঙ্কার "সংস্কৃত যন্ত্র" প্রেস এবং সর্বশুভকরী পত্রিকার বের করেন। পত্রকিটি সম্পাদনার দায়ীত্ব পালন করতেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যশাস্ত্ররে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজের প্রকৃত অবস্থা এবং ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য বিদ্যাসাগরকে দায়ীত্ব দেয়। মাত্র ১২ দিনে বিদ্যাসাগর এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষক পারিষদের সম্পাদক ডাঃ ময়েটের কাছে পেশ করেন।

এই রিপোর্টটিকে উচ্চ শিক্ষা আধুনিকানয়নের মাইলফলক বলা যেতে পারে। রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন । ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৪০ টাকা বেতনে কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তিনি অষ্টমী এবং প্রতিপদে ছুটি বন্ধ করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি চালু করেন এবং গ্রীষ্মকালীন ছুটি চালু করেন। আগে এ কলেজে শুধুমাত্র বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ সন্তানেরা লেখাপড়ার অধিকারী ছিল। তিনি ১৮৫৩ সালের জুলাই মাসে কায়েস্তদের এবং ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাস হতে সকল হিন্দুদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের বেতন পদ্ধতি চালু করেন। প্রথমে মাসে দুই টাকা হারে পরে এক টাকা হারে বেতন নির্ধারণ করেন।

১৮৫৩ সালে বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রাম বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান মাইলফলক। এবছর কালিপ্রসন্ন সিংহ বাংলা ভাষা অনুশীলনের জন্য বিদ্যোতসাহিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস "হুতুম পেঁচার নকশা" লিখে আরেকটা মাইলফলক স্থাপন করেন।

১৮৫৫ সালে সরকার বিদ্যাসাগরকে অতিরিক্ত ইনেস্পেক্টরের দায়ীত্ব প্রদান করেন। তিনি নদিয়া, হুগলী, বর্ধমান, ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে বিশটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এবছর অক্টোবর মাসে বিধবাবিবাহ আইনের জন্য সরকারের কাছে লিখিত পত্র দেন এবং দুই মাস পর বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য সরকারকে চিঠি লিখেন।

বিধবাবিবাহ আইন পাশ না করার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব ত্রিশ হাজার স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন সরকারের নিকট পেশ করেন। অন্যদিকে বিদ্যোৎসাহনী সবার পক্ষ থেতে কালীপ্রসন্ন সিংহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে বিদ্যাসাগরকে সাহায্য করেন। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহের সাল। এবছর সালে হুগলী জেলায় সাতটি, বর্ধমানে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরের বছর হুগলী জেলায় তেরটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদিয়াতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এতদিনে তিনি বাঙালি জাগরণের অগ্রদূত রূপে মহিমান্বিত। ১৮৫৭ সনে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদকের দায়ীত্ব নেন এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সে সময়ে কোন অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের উপস্থিতি ছিল তখনকার আয়োজকদের জন্য গর্বের। ১৮৫৮ সনের ২২ শে মার্চ গদাধর শেঠের বাড়িতে রাম নারায়ণ তর্করত্ন রচিত প্রথম সামাজিক নাটক "কুলীনকুলসর্বস্ব" এর তৃতীয় মঞ্চায়নে বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন। ২৫শে মার্চের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় সেটা সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত হয়। ৩১ শে জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চায়িত হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনূদিত শ্রীহর্ষের নাটক "রত্নাবলী "। ৪ জুলাই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেখানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল রাম গোপাল মল্লিকের সিঁদুরিয়াপট্টির বাড়িতে উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত "বিধবা বিবাহ" নাটকের মহড়া এবং ২৩ এপ্রিল মেট্রোপলিটন থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। বিদ্যাসাগর মহড়াসহ একাধিক মঞ্চায়নে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা ১২৬৩ সনের ২৩শে অগ্রহায়ণ, রবিবার প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রী কালীমতি দেবী এবং পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কালীমতি দেবীর বয়স তখন দশ। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল ১২ নং সুকিয়া স্ট্রিট, কোলকাতা। সেদিন বরযাত্রার পথে দুই হাত পর পর পুলিশ পাহাড়া রাখা হয়েছিল। সারা পথ ছিল উৎসুক জনতার ভীড়। বরের পালকির ডানে এবং বামে পাল্কি ধরে হেঁটেছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধুরা। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মন্ডলীদের কয়েকজন। পরদিন ২৪শে অগ্রহায়ণ পাত্র

মধুসূদন ঘোষের সাথে দ্বীতিয় বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রী ঈশানচন্দ্র মিত্রের বার বছরের বিধবা কন্যা। এই বছরেই ১১ই ফাল্গুন দুর্গানারায়ণ বসু এবং মদনমোহন বসু নামের দুই ভাই এক সাথে দুজন বিধবাকে বিয়ে করেন। এরা ছিলেন সু বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর কাকাত ভাই।

১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগর কোলকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পরিচালনার দায়ীত্ব নেন। ১৮৬৪ সালে জার্মানির লিপজিগ শহরের বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করে। এ সময়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফ্রান্সে আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হলে বিদ্যাসাগর ঋণ করে তাঁকে ১৫০০ টাকা দান করেন। এ বছর তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অনারারি সদস্য নির্বাচিত হন।

১৮৬৬ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি বহুবিবাহ বন্ধের জন্য তিনি পুনরায় সরকারের কাছে চিঠি লিখেন। ডিসেম্বর মাসের দিকে উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে ফেরার পথে বগিগাড়ী উল্টে যায়। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এদুর্ঘটনার পর তিনি স্বাভাবিক কর্মদক্ষতা অনেকটা হারিয়ে ফেলেন এবং মানসিক অশান্তিতে ভুগতে থাকেন।

১৮৭০ সালে নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের সাথে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ে বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দেন। এবছর তিনি ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকারের বিজ্ঞান সভায় এক হাজার টাকা দান করেন। ১৮৭১ সালে কাশীতে তাঁর মা ভগবতী দেবীর মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ সালে মারা যান বাবা ঠাকুর দাস বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। এবছর তিনি কোলকাতায় বাড়ি তৈরি করেন। ১৮৭২ সনে ধনী ছেলেদের পড়াশুনার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সে স্কুলের বেতন ছিল ৫০ টাকা। ১৮৮০ সালে তিনি বৃটিশ সরকারের সি, আই, ই (Companion of the order of the Indian Empire) উপাধিতে ভূষিত করে। ১৮৮৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করে।

১৮৮৮ সালে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এরপর ১৮৯০ সালে বিদ্যাসাগর নিজের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম মায়ের নামে ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরের বছর ১৮৯১ সনের ২৯ জুলাই রাত আনুমানিক দুটার সময় কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

(সূত্রঃ বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রথম খন্ড, সম্পাদনা: দেব কুমার বসু, প্রকাশ কাল: ১৯৬৬।)

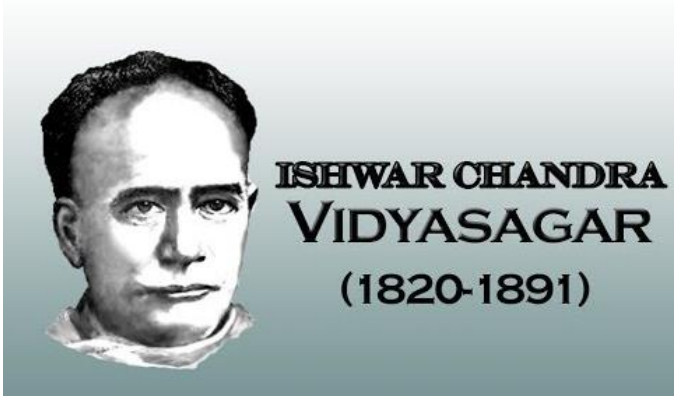

অর্চনা

-বাপ্পী রায়

`পুতুল পূজা করেনা হিন্দু কাঠ মাটি দিয়ে গড়া
মৃণ্ময় মাঝে চিন্ময় হেরে হয়ে যাই আত্মহারা`

-স্বামী বিবেকানন্দ

বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় যখন শিক্ষক এই পংক্তিটির ভাবসম্প্রসারণ করতে বলেছিলেন; সেই সময় এই কথার অর্থ শুধু মনে হয়েছিল, দেবী দুর্গার প্রতিমা, যা আমাদের পাল বাবু কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সবার সামনে উপস্থাপন করেন। এখনো যখন দশভুজা মায়ের এই অপূর্ব সুন্দর নয়নাভিরাম রূপ দেখি, আবার যেন ঠিক সেই মুহূর্তটাতেই ফিরে যাই। সেই সময়ের পুজোর দিনগুলিতে নানারকম মণ্ডামিঠাই আর রসালো ফলমূল আর নতুন পোষাক পরে ঘুরে বেড়ানো ছিল আমার কিশোর মনের উন্মাদনা। দেবী মূর্তির অনবদ্য ঝলমলে রকমারি পরিবেশনা আর মহাসমারোহের অপরূপ আলোকসজ্জায় আমাদের পুরো শহর যেন ঝকঝকে হয়ে উঠত। এই সবকিছু কিশোর মনে এক অদম্য উল্লাস আর অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতো, আর সেই উন্মাদনায় ভর করেই যে আমি, আমার ভুবন মোহিনী মায়ের স্নেহবৎসল সন্তানরূপে প্রতি বছর পূজোর সময় পুনরুজ্জীবিত হই; তাই হয়ত আমাদের কাছে শিক্ষকের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

মা মানেই শক্তি, আনন্দ, আদর-স্নেহ, ভালবাসা আর জীবন। মা একাধারে বিদ্যা, জ্ঞান, ধনরত্ন, ঐশ্বর্য, সম্পদ, সৌন্দর্য ও অনুপ্রেরণা; এইসকল বিশেষণ একত্রিত হয়েও মনে হয়না আদৌ কখনো, মা এর মহিমা মানুষের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করতে পারবে?

মা, যিনি আমার জীবনে প্রথম শিক্ষাগুরু। মার কাছেই শিখেছি অ আ ক খ বলতে পড়তে ও লিখতে। আদর্শলিপি থেকে আত্মস্থ করেছি সদা সত্য কথা বলবে, ঈশ্বরকে বন্দনা কর, ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপর বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে, যখন নিজেকে আশেপাশের অন্যদের তুলনায় মনে হত খুবই নগণ্য এবং যখন কোন শখ যা আমার সব বন্ধুদের কাছে সহজলভ্য আর আমার জন্য দুষ্প্রাপ্য হত, তখন শুধু একমাত্র ভরসা ও আস্থা মা, যে আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার মূল্য দিত। অনেক ক্ষেত্রে আমার অন্যায় আবদার বা বিলাসিতা সামর্থ্য বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও পুরণের জন্য আপ্রাণ যিনি চেষ্টা করতেন, তিনি আমার মা। আজ যখন আমি উপরের কথাগুলোর যথার্থতা অনুধাবন করতে পেরেছি, তখন মনে হচ্ছে যে, আমার সেই সকল আবদার যা ছিল নিছকই অপ্রয়োজনীয় প্রার্থনা, আর যা আমার অহংকার ও গর্বের তা হচ্ছে আমার মা,।আবার যখন দেখি আমার ছোট্ট সোনা, যে জন্মের প্রথম দিন থেকে ছোট দুইখানা হাতে আমার ভরন-পোষণের দায়িত্ব নিয়ে, অপরিমেয় আদর, ভালবাসা ও অনাবিল আনন্দ দিয়ে আমার পৃথিবীটা ভরিয়ে রেখেছে সেও আমার মা। তাই সেই মায়ের পায়েই এই অর্চনা।

আমার জীবনে এসে ভালবাসা ও সোহাগ দিয়ে সকল দুঃখ গ্লানি বিষাদ নিজের করে নিয়ে, বিনা বিবেচনায় অপরিমেয় আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছে যে সহযোদ্ধা, সেও আজ একজন মা। অক্লান্ত পরিশ্রম আর বলিদানে সন্তানের অস্তিত্ব ধরিত্রীর বুকে টিকিয়ে রাখতে লড়ে যাচ্ছে সেও মা।

আমাদের সকলের জীবনে নানাভাবে, কখনো সংগীত শিক্ষার গুরু হিসেবে, কখনো অসুস্থতা থেকে সুস্থতার পথে ফেরার অনুপ্রেরণা রূপে, আবার কখনো বা অর্থনীতির অতল সমুদ্রে প্রায় ডুবন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধারকারিনী হয়ে যিনি জয়যাত্রা পরিচালিত করেন, তিনিই মা।

সকল মায়েদের পায়েই আজকের অর্চনা।

ভিন্ন চোখে রামায়ণের নারীগণ

-শর্মিষ্ঠা সাহা

রামায়ণের রচয়িতা একজন পুরুষ, পুরুষের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বও স্পষ্ট। কাহিনীতে রাম - লক্ষ্মণ মূল চরিত্র, রাবণ খল নায়ক। হনুমান, দশরথ, বিভীষণ, ভরত, লব, কুশ, সুগ্রীবের মত বহু গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্রের আনাগোনা সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে। যাদের বেশিরভাগই সমাজের চোখে ইতিবাচক চরিত্র, সহজভাবে বলতে গেলে ভাল মানুষ। অপরদিকে রামায়ণের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক নারী চরিত্র সীতা, যে রাজরাণী হয়েও জনমদুঃখী, বনবাসী। আবার যুগ যুগ ধরে বাঙালি নারীদের আইডলও। স্বামীর কারণে সব ছেড়ে তাকে বনবাসে যেতে হল। রাবণ তাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে গেল, বেধে গেল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তার কারণেই যত প্রাণ নাশ, রাবণ বধ। সীতা উদ্ধার হলেও তার জীবনে শান্তি ফিরে এল না। অগ্নিপরীক্ষা দিয়েও প্রজাদের খুশী করা গেল না, আবার যেতে হল বনবাসে। এবার একাকী – রাম লক্ষণ থেকে গেলেন অযোধ্যায়। কিন্তু পুরো ঘটনায় তার অপরাধটা কোথায় সেটা প্রশ্ন হয়েই রইল। দ্বিতীয় দফায় বনবাস শেষ করে ফিরে এলে প্রজাদের সন্দেহের তীর আবারও তাকে বিদ্ধ করে। অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি সীতা এবার স্বেচ্ছায় জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাতালে প্রবেশ করল । আর এর মধ্য দিয়েই প্রতিবাদ জানিয়ে গেল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অপমানের বিরুদ্ধে। সীতার জীবনের সকল দুঃখের মধ্যে একটাই প্রাপ্তি – স্বামীর ভালবাসা। সীতার প্রতি রামের ভালবাসার প্রথম প্রমাণ মেলে তাকে বনবাসে নিয়ে যেতে রাজী হওয়ার মধ্য দিয়ে। লক্ষণ কিন্তু ঊর্মিলাকে নিয়ে যায়নি, তাকে দীর্ঘ সময় একা অযোধ্যায় কাটাতে হয়েছে। সীতা হরণের পর রামের ভালবাসার তীব্রতার পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রতিটি পদক্ষেপে – রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধার করা অবধি । পরবর্তীতে এত ভালবাসা স্বত্ত্বেও তিনি যে সীতার সকল অপমান নীরবে সহ্য করলেন – সেটা কি তার মহত্ব নাকি সমাজের কাছে পরাজয়, সে বিশ্লেষনের ভার গবেষকদের।

রামায়ণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের বেশিরভাগই নেতিবাচক অথবা উপেক্ষিত। প্রথমেই আসে কৈকেয়ীর কথা, যার সেবায় খুশী হয়ে রাজা দশরথ বর দিতে চেয়েছিলেন। এখানে তিনি চিরায়ত পতিপ্রাণা স্ত্রী। কিন্তু ঝামেলা বাঁধাল আরেক নেতিবাচক নারী চরিত্র দাসী মন্থরা। তার বুদ্ধিতে রামকে সড়িয়ে নিজের ছেলে ভরতকে রাজা বানানোর বর চাইলেন দশরথের কাছে। এভাবেই নারীর স্বভাবসূলভ কোমলতা থেকে বেরিয়ে কূটচাল দিয়ে হলেন কূটনীতিক – রামায়ণের ঘটনাপ্রবাহে যার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান অন্দরমহলে। স্বামী হচ্ছে সংসারের কর্তা বা প্রভু – তার কথামত চলাটাই রীতি। এর ব্যতিক্রম হলে সমাজের চোখে সে নারী বিপথগামী। তাইতো রাষ্ট্র পরিচালনায় কৈকেয়ীর হস্তক্ষেপ আজও আমাদের সমাজ ভাল চোখে দেখে না বা মন থেকে মেনে নিতে পারে না । রামায়ণের কাহিনীতে কৈকেয়ী প্রভাশালী চরিত্র কোন সন্দেহ নেই – সে না থাকলে রামের বনবাস উপাক্ষানের সূচনাই হত না। কিন্তু সমাজ ও পাঠকের বিবেচনায় অবশ্যই নেতিবাচক চরিত্র।

রামায়ণের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র সূর্পনখা। একজন মানুষকে যতটা নেতিবাচকরূপে উপস্থাপন করা সম্ভব ততটাই করা হয়েছে সূর্পনখাকে। সে অপরের স্বামীকে বিয়ের প্রলোভন দেখানোর জন্য মোহময়ী রূপ ধারন করে, তার কারণেই সীতাকে হরণ করে রাবণ, যার ফলস্বরূপ রাবণ বধ এবং রাক্ষসদের পরাজয়। কিন্তু একটু ভিন্ন চোখে তার চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সূর্পনখা এক স্বাধীনচেতা নারীর নাম যে পুরুষের নয় নিজের ইচ্ছেমত চলতেই অভ্যস্ত। নারীর চিরায়ত বিনয়ী লাজুক ভাবমূর্তির পাশে সম্পূর্ণ বিপরীত এই চরিত্রটি। সূর্পনখা বিধবা হলেও পুরুষ ও নারীর আদিম আকর্ষণের সত্য প্রকাশে বিব্রত নয়। একাকী জীবনের আবসান ঘটাতে রামকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে সে দ্বিধান্বিত নয়, বরং এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছে। রাম রাজী না হওয়াতে তার বুদ্ধিমত লক্ষনকেও সে একি প্রস্তাব দেয়। রাম লক্ষ্মণের কূটনৈতিক চালের কাছে সূর্পনখার সোজাসাপটা বুদ্ধির পরাজয় স্বাভাবিক। তবে তার সাহসিকতায় কোন কমতি নেই।

রামায়ণের অন্যান্য নারী চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঊর্মিলা, তারা, মন্দোদরী, সরমা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুলোচনা, সরমা প্রমুখ। এদের মধ্যে মন্দোদরী এবং তারাকে গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক নারী চরিত্ররূপে উপস্থাপন করা হলেও অন্যদের প্রতি লেখকের উপেক্ষা স্পষ্ট। মন্দোদরী লঙ্কারাজ রাবণের পাটরানী হিসাবে যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সবসময় সীতা হরণের বিরোধিতা করেছেন এবং পরোক্ষভাবে তার কারণেই সীতা নিরাপদে লঙ্কায় অবস্থান করতে পেরেছেন। মন্দোদরী পুত্র মেঘনাদকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত করতে চেষ্টা করেছেন এই যুক্তিতে যে, রাবণ পরস্ত্রী সীতাকে হরণ করে অন্যায় করেছেন। আর সমগ্র লঙ্কাবাসীকে এর মাসুল দিতে হচ্ছে। যদিও রাবণ বা মেঘনাদ কাউকেই তিনি যুদ্ধ থেকে নিবৃত করতে পারেননি তবুও তার এই প্রচেষ্টা মানুষ হিসাবে অবলা নারীর ভূমিকা ছাড়িয়ে তাঁকে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। তিনি শুধু রানী নন, রাজার মন্ত্রণাদাতাও বটে - রাজা তার সকল উপদেশ গ্রহণ করুন বা নাই করুন।

রামায়ণের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র বালির স্ত্রী তারা। রাম যখন সীতা উদ্ধারের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন তখন সুগ্রীবের রাজ্য প্রাপ্তিতে সাহায্য করতে রাজী হয়ে যান। একাজ করতে গিয়ে তিনি অন্যায় যুদ্ধে বালিকে হত্যা করেন। তারা কিন্তু বিষয়টি বুঝে আগেই বালিকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু বালি তার কথা না শুনে জীবন হারায়। এরপর নতুন রাজা সুগ্রীব তাকে বিয়ে করে। পরবর্তীতে নিজের রাজ্য প্রাপ্তির আনন্দে সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি ভুলতে বসে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে লক্ষণ সুগ্রীবকে কিস্কিন্ধ্যা হতে বিতাড়িত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু নিজের কূটনৈতিক বুদ্ধি দিয়ে রাজ্য রক্ষা করেন রাজমহিষী তারা।

রামায়ণে যে নারী চরিত্রটি সবচেয়ে উপেক্ষিত সেটি হচ্ছে লক্ষণের স্ত্রী ঊর্মিলা। রাম ও সীতার সংগে লক্ষণ চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে চলে যাবার পর তার হৃদয়ের বেদনার খবর কে নিয়েছে? ঊর্মিলা বুঝেছিল লক্ষণের কাছে স্ত্রীর চেয়ে দাদার প্রতি কর্তব্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বামীহীন চৌদ্দ বছর নির্বিঘ্নে পার করতে সে নিদ্রা দেবীর শরণাপন্ন হয়, যিনি তাকে পুরোটা সময় ঘুম পারিয়ে রাখেন। আর এভাবেই নিরবে নিভৃতে সীমাহীন অবহেলায় কেটে যায় তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো বছর। অথচ অন্যদের ত্যাগের মহিমা যখন রামায়ণের পাতায় পাতায়, ঊর্মিলার নিরব ত্যাগ তেমন গুরুত্ব পায়নি। লক্ষ্মণের মা সুমিত্রা আরেক অবহেলিত নারী। যার ছেলে নিজের সিদ্ধান্তে চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে চলে যায় রামের

নিরাপত্তার জন্য। রাণী হয়েও তিনি নিজের সন্তানের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার বঞ্চিত, উপেক্ষিত। রাবণ পুত্র মেঘনাদের স্ত্রী সুলোচনা, বিভীষণের স্ত্রী সরমা নিজেদের মহিমায় উজ্জ্বল হলেও লেখকের মনোযোগ খুব একটা আকর্ষণ করেতে সমর্থ হয়নি।

সামগ্রিকভাবে পুরুষশাষিত সমাজের মতই রামায়ণও পুরুষ চরিত্রদের দ্বারা চালিত। কাহিনীর স্বার্থে নারী চরিত্রের সংযোজন হলেও তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ক্ষমতাশালী ও বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। তবে মুষ্টিমেয় সংখ্যক হলেও তাদের উপস্থিতি প্রমাণ করে, সেই অতি প্রাচীন কাল থেকেই নারীগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মা, স্ত্রী ও কন্যার প্রচলিত রূপের উর্ধ্বেও নারীর নিজস্ব একটা পরিচয় আছে – এ সত্য প্রমাণে যুগ যুগ ধরে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নারী জন্ম নিয়েছেন। দেশ, কাল ও জন্ম পরিচয়ের গন্ডিতে তাদের আবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

মিনিগল্প

সম্পর্ক

-কমলেশ রায়

বেশ ছিলাম। অনেকটা সময় কোনো হট্টগোল নেই, একেবারে নিরিবিলি পরিবেশ। জোরে নিঃশ্বাস নিলেও শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ আমার শরীর শিরশির করে উঠল। তিরতির করে কাঁপছে দেহ। ভেতরে মৃদু কম্পন। আমি দুলছি, থরথর করে কাঁপছি। কী যে এক অনুভূতি। আমি যেন আমাতে নেই। শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। যতটা জোরে পারা যায় শব্দ করে তাকে ডাকলাম। সে তখন অন্য কাজে ডুবে আছে। আমার ডাক কি শুনতে পাচ্ছে না? আমার দিকে তাকানোর সময়ও কি তার নেই? অবশেষে সে শুনতে পেল। দ্রুতে এগিয়ে এসে ধরল আমাকে। কাঁপতে থাকা আমার দিকে তাকিয়ে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। কোমল হাতে আমাকে চেপে ধরে মুখটাকে কাছে, আরও কাছে এনে বলল, কী হয়েছে তোমার? ভরাট পুরুষালি গলা। কণ্ঠে অদ্ভুত মাদকতা। সেই আবেশ ছড়িয়ে পড়ল আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। নিজের অজান্তেই ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় কে যেন বলে উঠল: কিছুই হয়নি। কী করছিলে তুমি?

সেমিনার পেপারের কাজ করছিলাম।

এখনও শেষ করোনি। কাল না জমা দিতে হবে?

শেষ করতে আর পারছি কই।

কেন, কী হয়েছে?

মন বসাতে পারছি না।

মনের আবার কী হলো?

উড়–উড়– করছে।

কেন?

বেচারা চুরি হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে আছে।

কী বলো, এখনও চুরি হয়নি?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

অবস্থা দেখছি গুরুতর। হি-হি-হি।

গুরুতর না, অবস্থা গুরুতম।

তাই বুঝি। আহা রে, কে করল এমন সর্বনাশ?

শয়নে স্বপনে আধো জাগরণে কেবল যাকে দেখি সে।

খুব কথা শিখেছো দেখছি। তা কে শেখায়?

কিছু জিনিস শেখাতে হয় না। সবাই এমনি এমনিই শিখে যায়।

তাই নাকি ।

হ্যাঁ তাই। আহার করা কি কাউকে শিখিয়ে দিতে হয়? জন্মানোর পর থেকেই সবাই গপগপ করে খেতে শুরু করে।

মুখে আজ দেখি ফুলঝুরি ছুটছে। তাহলে মাঝে মাঝে অমন চুপ করে যাও কেন?

তখন চুপ করে থাকতে ভালো লাগে তাই। কথায় আছে না, নীরবতা হিরণ্ময়।

তবে যাই বলো, নীরবতা আমার ভালো লাগে না।

লাগবে কী করে। নগরীর শব্দদূষণে অভ্যস্ত হয়ে গেছো যে।

তুমি বুঝি নগরীতে থাকো না?

থাকি। তবে শব্দদূষণ, যানজট- এসব নাগরিক যন্ত্রণা আমার ভালো লাগে না।

ধ্যাৎ! আবার চলে গেল।

কী চলে গেল?

বিদ্যুৎ। ঘন্টায় ঘন্টায় যায়। আর মাঝে মধ্যে আসে। কী যে অসহ্য।

অসহ্যই তো হওয়ার কথা। লোডসেডিংও তো আরেক নাগরিক যন্ত্রণা।

তোমার ওখানে বিদ্যুৎ আছে?

না, নেই।

ওখানেও চলে গেছে।

দেড় ঘন্টার ওপরে।

বলো কী, এতক্ষণ লোডসেডিং?

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি তো বলি, আমাদের এখানে বিদ্যুৎ যায় না, মাঝে মাঝে আসে।

এটা অবশ্য ভালো বলেছো।

প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ।

পিপ পিপ শব্দ হচ্ছে কিসের?

চার্জ শেষ। যেকোনো সময় লাইন কেটে যাবে। সঙ্কেত দিচ্ছে। সহ্য হচ্ছে না, বুঝলে।

কী সহ্য হচ্ছে না?

এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

তা হতেই পারে। সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। একটু জেলাস তো হতেই পারে।

হ্যাঁ, তোমার কথা শুনে জেলাসের মাত্রা আরও বেড়েছে; শুনতে পাচ্ছো?

পাচ্ছি। তাহলে কাল ক্যাম্পাসে দেখা...।

কথা শেষ হলো না। তার আগেই লাইন কেটে গেল। কী আশ্চর্য! একটু বাদেই বিদ্যুৎ চলে এলো। সংযোগ দিতেই আমার শরীর ঝলমল করে উঠল। সে আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। এই হাসিতেই ওই মেয়েটা পটেছে। তাতে আমার কী? আমাদের সম্পর্কে সেটা মোটেও প্রভাব ফেলেনি। আমাকে তো সে একটুও অযত্ন বা অবহেলা করে না। কারণ আমি হচ্ছি তার প্রিয় মোবাইল ফোন।

গীতি নৃত্যনাট্য- হৈচৈ এর বাগানে

-সুস্মিতা সাহা

চরিত্র লিপি:

পাখি : দোয়েল, শ্যামা, ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক, চড়ুই, বাবুই, ঘুঘু, কাঠ-ঠোকড়া, দাঁড়-কাক, চিল, মাছরাঙা, শকুন, বাজপাখি, ঈগল।

ফুলগাছ : ফুলগাছ - পলাশ, শিমুল, গাঁদা, সূর্যমূখি, ডালিয়া, গন্ধরাজ, তমাল ইত্যাদি

ফলগাছ : বড়ই, আম, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি

বর্ণনাকারী: ১/২ জন মানব শিশু

ঘোষক : ১ জন

পাহারাদার: ৫/৬ জন (শকুন, বাজ, ঈগল পাখির বেশেও হতে পারে বা অন্য কোনো বেশেও হতে পারে)

প্রত্যেক শিশু এক একটা পাখি অথবা গাছের বেশ নিবে। শকুন, বাজপাখি ও ইগল একাধিক হতে পারে। মঞ্চের দুই পাশে সব পাখি বসে থাকবে। সারা মঞ্চ জুড়ে ফুল ও ফল গাছ ছড়িয়ে থাকবে।

বর্ণনাকারী: এক দেশে একটা অনেক বড় বাগান ছিলো। বাগানের নাম হৈচৈ..। আর বাগানটার মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একটা আঁকাবাকা নদী। কলকল ছলছল করে বয়ে চলা এই নদীর নাম কলকাকলি। নদীর এ পাড়ে বাস করে.. দোয়েল, শ্যামা, ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক, চড়–ই, বাবুই, ঘুঘু, কাঠ-ঠোকড়া, দাঁড়-কাক, চিল, মাছরাঙা আরো অনেক পাখি.. এখানে যারা বাস করে.. তারা সারাদিন নানা রকম আনন্দ.. গান.. নাচ.. আর অনেক অনেক মজা করে সময় কাটায়..

বর্ণনাকারী বসে পরে। কোকিল উঠে এসে ডাকে..

কোকিল : কুহুউ.. কুহুউ.. কুহুউ..

এরপর দোয়েল, শ্যামা, ময়না, টিয়া, শালিক, চড়ুই, বাবুই, ঘুঘু, কাঠ-ঠোকড়া, দাঁড়-কাক, চিল, মাছরাঙা সবাই উঠে এসে নেচে নেচে গান করে..

গান: (রবীন্দ্র সংগীত - চার লাইন) আমরা নতুন যৌবনেরই দূত..

গান শেষে সবাই এক এক করে নিজের নিজের ডাক দেয় তারপর বসে পরে। বর্ণনাকারী উঠে আসে।

বর্ণনাকারী: আর.. ওপাড়ে বাস করে.. শকুন, বাজপাখি, ঈগল পাখি.. ওরা ছিলো আকারে বড়.. আর সম্পূর্ণ বাগানের রাজা..

বর্ণনাকারী বসে পরে। শকুন, বাজপাখি, ঈগল উঠে এসে (ক্ষমতা বোঝা যাবে এমন মিউজিক/ড্রাম বিট) এর সাথে নাচ করে। নাচ শেষে শকুন বাজ আর ঈগল বসে। বর্ণনাকারী ওঠে..

বর্ণনাকারী: একটা বাগান.. নদী দিয়ে দুই ভাগ.. একপাশে রাজা পাখি.. আর একপাশে অন্য সব পাখিরা.. নদীর এপাড় আর ওপাড়। তাদের কথা.. গান.. সাজ-পোশাক.. সব আলাদা.. একদিন..

বর্ণনাকারী চলে যাবে। শকুন, বাজপাখি, ইগল মঞ্চের মাঝখানে আসবে।

ঈগল : আচ্ছা.. নদীর ওপারের পাখিরা আমাদের সুরে তো গান গায় না!

শকুন : তারা আমাদের মত করে কথাও বলে না!

বাজপাখি : ঠিক বলছো। ওদের সব কিছু আলাদা..

ঈগল : আমরা এই বনের রাজা।

শকুন : আমরা রাজা; কিন্তু ওরা আমাদের পথে চলে না!

বাজপাখি : ঠিক বলেছো। ওরা নিজের মত চলে..

সবাই : ওরা নিজের মত চলে, ওরা নিজের মত বলে
তা হবে না, তা হবে না, হবে না.. হতে পারে না
আমরা বড়, আমরা রাজা।
আমাদের সুর, আমাদের গান, আমাদের কথা
চলবে সারা রাজ্য জুড়ে।

রাজা পাখিরা চলে যায়। বর্ণনাকারী আসে।

বর্ণনাকারী: যেই কথা সেই কাজ.. রাজা পাখিরা আইন জাড়ি করলো.. বনের সব পাখিরা তাদের মত করে কথা বলবে..

বর্ণনাকারী বসে। ঘোষক উঠে সারা মঞ্চ জুড়ে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করে।

ঘোষক : ঘোষণা ঘোষণা ঘোষণা.. এখন থেকে এই বনের সব পাখিরা রাজা পাখিদের মত করে কথা বলবে.. তাদের সুরে সুর মেলাবে.. কেউ যদি এই আইন অমান্য করে তাকে শাস্তি পেতে হবে.. ঘোষণা.. ঘোষণা.. ঘোষণা..

ঘোষক চলে যায়। বর্ণনাকারী আসে।

বর্ণনাকারী: ঘোষকের ঘোষনা শুনে হৈচৈ এর বাগানে হৈচৈ পড়ে যায়..

বর্ণনাকারী বসে। দোয়েল, শ্যামা, ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক, চড়ুই, বাবুই, ঘুঘু, কাঠ-ঠোকড়া, দাঁড়-কাক, চিল, মাছরাঙা মঞ্চের মাঝ খানে এসে একে অন্যের সাথে কথা বলবে..(২/৩ জন করে দলে ভাগ হয়ে এক একটা ডায়ালগ বলবে।

২/৩ জন : কি বললো?

২/৩ জন : ওদের মত করে বলতে হবে?

২/৩ জন : ওদের সুরে গাইতে হবে?

সবাই : এ কেমন আইন?

কোকিল : কোকিল ডাকে কুহু.. কোকিল আর কুহু কুহু ডাকবে না?

কাক : কাক ডাকে কাকা.. কাক আর কাকা করবে না?

ময়না : ময়না আর গাইবে না গান?

কাঠঠোকরা : কাঠ-ঠোকরা করবে না কাঠ ঠকা ঠক ঠক..

বাবুই : বাবুই আর গড়বে না নিজের সুরের ঘর?

শালিক : এ আইন কেমন আইন!

চড়ুই : চড়ুই আর তিড়িং বিড়িং নাচবে না?

টিয়া: রাজারা আমাদের কথা কেড়ে নেবে?

দোয়েল : কিছুতেই না, কিছুতেই না..

পাখিদের কথার সাথে সাথে গাছেরা মন খারাপ করে নিজ নিজ জায়গায় বসবে। সব পাখি, ফুল গাছ, ফল গাছ মঞ্চ জুড়ে মন খারাপ করে ঘুরে বেড়াবে। কারো মুখে হাত যেনো ভাবছে, কারো মাথায় হাত, কারো কোমরে হাত।

শ্যামা : নিজেদের ভাষা যায় কি ভোলা?

সবাই : (ফুল ফল গাছ সহ সবাই বলবে) না.. না।

চিল : আমরা কথা বলবো আমাদের ভাষায়।

সবাই : (ফুল ফল গাছ সহ সবাই বলবে) আমাদের ভাষায়..

মাছরাঙা : গান গাইবো আমাদের সুরে।

সবাই : (ফুল ফল গাছ সহ সবাই বলবে) আমাদের সুরে..

ফুল গাছ সব একসাথে বলে..

পাখিরা আর গাইবে না.. ফুল আর ফুটবে না..

ফলগাছ : ফল আর ধরবে না..

সবাই একসাথে নেচে নেচে গান করে..

গান: (রবীন্দ্র সংগীত- চার লাইন) আমরা হার মানবো না হার মানবো না

সবাই বসে। বর্ণনাকারী ওঠে।

বর্ণনাকারী: বাগান জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো.. রাজারা গেলো ক্ষেপে..

রাজা পাখির দল ওঠে।

গান: (রবীন্দ্র সংগীত) ওহ একি স্পর্ধা..

নাচ শেষে রাজা পাখিরা বসে। বর্ণনাকারী ওঠে।

বর্ণনাকারী: পাখিরা এখন কি করবে! শুরু হলো বৈঠক..

সব পাখিদের মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট দলে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যাবে। ফুল ও ফলের গাছও থাকবে। একসময় সব দলগুলো একসাথে বলে উঠবে.. : না.. না.. মানি না..

এরপর সবাই নেচে নেচে গান করবে..

গান: ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।

নাচ শেষে মঞ্চ জুড়ে মিছিল হবে।

সবাই :(স্লোগানের মত করে) মানি না, মানবো না

অন্য ভাষায় কথা মোরা বলবো না

আমার ভাষা, আমার চাই.. আমার চাই

সব পাখিরা বসে। রাজা পাখিরা ওঠে।

ঈগল : এই প্রতিবাদ বন্ধ করতে হবে। রাজ্য জুড়ে পাহারা বসাও..

শকুন : এমন পাহারা.. যেনো সবাই বুঝতে পারে আমাদের কথাই শেষ কথা

বাজপাখি : পাহাড়া.. পাহাড়া.. প্রতিবাদ বন্ধ করো..

রাজা পাখিরা বসে। পাহড়ারাদার পাখিরা ড্রাম বিটের সাথে শক্তি প্রদর্শিত হয় এমন নাচ করে মঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় পজিশন নিবে। পজিশন নেওয়া শেষ হলে রাজাপাখিরা ওঠে।

ঈগল : ঘোষনা করে দাও.. বাগানে কেউ দল বেঁধে ঘুরতে পারবে না..

শকুন : জানিয়ে দাও.. আমাদের কথা মেনে না নিলে সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে..

বাজপাখি : ঘোষক.. ঘোষক.. আইনটা সবাইকে জানিয়ে দাও..

রাজারা বসে। ঘোষক ওঠে।

ঘোষক : ঘোষণা.. ঘোষণা.. নতুন আইন.. নতুন আইন.. এই বাগানে কেউ দল বেধে চলতে পারবে না.. বলতে পারবে না.. আইন ভঙ্গকারীর উপযুক্ত শাস্তি হবে.. ঘোষণা.... ঘোষণা....

ঘোষক বসে। বর্ণনাকারী ওঠে।

বর্ণনাকারী: আইন জারি হয়ে গেলো.. কী করবে এখন সব পাখিরা! তারা কি মেনে নেবে! না, তারা মেনে নিলো না। তারা সিদ্ধান্ত নিলো আইন ভঙ্গ করার.. তারা আবার বৈঠক করলো.. মিছিলে গেলো..

সব পাখি, ফুল ফল গাছ মিছিল করবে। এই সময় গান হবে "আমরা করবো জয় একদিন„। পাহাড়াদাররা বাঁধা দেবে। তবু তারা শুনবে না, সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন পাহারাদাররা গুলি চালাবে। ৪/৫ জন পাখি গুলি বিদ্ধ হয়ে পড়ে যাবে। মিছিল তবু থামবে না। গানের শেষে স্লোগান হবে।

সবাই : আমাদের দাবি.. আমাদের দাবি..

মানতে হবে.. মানতে হবে..

আমাদের ভাষা আমাদের ভাষা

যে রুখবে সে পাবে সাজা।

সে পাবে সাজা।।

পাহারাদাররা পিছু হটে যেতে বাধ্য হবে। সবাই বসে। বর্ণনাকারী আসে।

বর্ণনাকারী: রাজা পাখিরা অন্য পাখিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হলো। রাজ্যে নতুন আইন হলো এখন থেকে এই বাগানের সব পাখিরা তার নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে। তাদের জয় হলো।

যাদের গুলি লেগে ছিলো তারা গোল হয়ে মঞ্চের মাঝখানে বসবে। বাকি সবাই তাদের পেছনে শহীদ মিনার হয়ে দাঁড়াবে। গান বেজে উঠবে "আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি„

~সমাপ্তি~

আমার স্মৃতিতে দাদাবাড়ি – "মান্দারী"

-ডাঃ সুরঞ্জনা জেনিফার রহমান

ছুটির দিন, তার পরও ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ভোর ৫টা। ইচ্ছে ছিল বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে পুরো সপ্তাহের স্বল্প ঘুমের শাস্তিটা পুরো করে নেব, কিন্তু হলো না। আজকে আকাশ খুব মেঘলা করেছে সিডনীতে , ভোরের হালকা শীতের আমেজে বিছানা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হলো না। অগত্যা কী আর করা, মাথার পেছনে আরেকটি বালিশ জুড়ে দিয়ে উঁচু হয়ে শুয়ে গানের যন্ত্রটা চালালাম । ভোরের অবিচ্ছিন্ন নীরবতায় গানটি শুনতে শুনতে কখন যে চোখ দুটো বন্ধ করে হারিয়ে গিয়েছিলাম অতীতের সেই দিনগুলোতে, বুঝতে পারিনি! সেই দিনগুলোতে, যে দিনগুলো হৃদয়ের গভীরে ঘুমিয়ে আছে বহুকাল, চলার পথের অনেক স্মৃতির ভাঁজে ভাঁজে আজও অমলিন হয়ে আছে আমার সেই সব নানা রঙের দিনগুলি...। শ্রান্ত পথের ক্লান্ত পথিকের মতো পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, গত হয়ে গিয়েছে অনেকটা সময়'বুঝতে কষ্ট হলো না। এভাবেই বুঝি আমরা হেঁটে যাই জীবনের একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তের দিকে ক্রমশ, ক্রমাগতভাবে অনন্তের দিকে।

আমি ফিরে যাই প্রায় তিরিশ বছর আগে। আমার দাদা বাড়ির কথা মনে হয়। আমি জন্মে আর দাদাকে দেখিনি । আমার কাছে দাদা বাড়ি মানে দাদির ঘর । প্রত্যেক বছর হয় গরমের ছুটিতে নয়তো শীতকালে ফাইনাল পরীক্ষার পরে আমাদের গন্তব্য ছিল মান্দারী পাঠান বাড়ি; লক্ষীপুর জেলার এক অসামান্য সুন্দর গ্রাম আমাদের এই মান্দারী । প্রথমে ট্রেন, তারপর বাস আর সবশেষে রিকশায় করে যাত্রা । চোখ বুজলে মনে হয় এইতো সেদিনের কথা । তখনো এইকালের পাকা দালান ওঠেনি দাদীর বাড়িতে। দাদীর ছিল ঘর চৌচালা, যেমন দাদা রেখে গিয়েছিলেন । ঘরের চালের বৃষ্টির সে কি মধুর শব্দ। আহ, কি সময় ছিল । শুধু ঘর না, ওই মাটির ও একটা আলাদা গন্ধ ছিল । সামনের পুকুরের একটা অন্যরকম মাদকতা ছিল ।

স্মৃতির বাতায়নে বসে আমি মুহূর্তে ফিরে যাই মান্দারী গ্রামের সেই চিরচেনা পথে... হেঁটে বেড়াই আমার সেই ছেলেবেলার খেলার মাঠের সবুজ চত্বরে, গ্রামের পথে গাছের শীতল পরশে, চৈত্র দুপুরের তীব্র রোদে মাঠের কোণে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসে থাকি আমি - পাশ থেকে ভেসে আসে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাউগাছের সুরেলা শব্দ; চেয়ে থাকি নদীর পাড় ঘেঁষা শিমুলগাছের দিকে যেখানে কেটেছে তপ্ত দুপুরের কত অলস প্রহর, এখনো যেন শুনতে পাই কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসে ডেকে ওঠা শালিকের শব্দ, বাঁশ ঝাড়ে ঘুঘুর ডাক কিংবা পাশের বাড়ির কবুতরের আওয়াজ। এখনো পূর্ণিমা রাতের চাঁদের আলোয় ফিরে যাই আমাদের সেই বিশাল উঠোনে ঝির ঝির হাওয়ায় কাটিয়ে দেওয়া সময়ে।

ওই সময় তো ফেসবুক ছিল না। গুটি কতক ঘরে টিভি চলতো। সবাই মিলে উঠোনে বসে কত গল্প হোত । নানা রঙের সেই দিনগুলোতে ছিল নানা খেলার আয়োজন...শাড়ি কেটে ছোট পুতুল বানানো হোত সেই পুতুলের বিয়েতে সে কি বিরাট আয়োজন। রোদেলা দুপুরে আকাশের বুকে ছোট-বড় রঙিন ঘুড়িগুলো যেন আজও যেন উড়ে বেড়াচ্ছে লাল, সাদা, হলুদ, বেগুনি নানা রঙের ঘুড়ি, লাটাই আর সুতোর টানে। পকেটে রঙিন মার্বেলের ঝন-ঝন শব্দ যেন আজও শুনতে পাই। এত দিনে ভুলেই গিয়েছি নারকেলের পাতা দিয়ে হাতচড়কি অথবা কাগজ দিয়ে নৌকো বা উড়োজাহাজ বানানোর কৌশল।

আজ সবই বিলীন হয়ে গিয়েছে সময়ের প্রবাহে। আজকের আধুনিক যুগের পরিবর্তনের ধারায় প্রযুক্তির প্রভাবে বদলে গেছে আমাদের জীবনযাপন, আনন্দের ধরন'ভিন্ন সংস্কৃতির খড়স্রোতে হারিয়ে গেছে সেই সব নির্মল আনন্দের সরল আয়োজন। আজ আর আমাদের গ্রামে খোলা আকাশ নেই, খেলার মাঠে যুবকদের তারুণ্যভরা উপস্থিতি নেই, নিয়মিত খেলার আয়োজন নেই, মাঠের পাশে সড়কের পাড়ে শান্ত বিকেলে বসে থাকা সেই সব চেনামুখ অগ্রজরাও আর নেই। চলে গেছেন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে চিরতরে।

আজ বহু বছর হোল দাদী কে চিঠি লিখি না। দাদীর কাছ থেকেও চিঠি পাই না। মনে আছে , চিঠি এলে সবার আগে খাম খুলে ত্রিফলা তেলের গন্ধ শুকতাম । এখন মানুষ চিঠির আশায় থাকে না, চিঠি আর কেউ লিখে না এখন। ছেলেবেলার সেই সরগরম বাড়িটা আজ কেমন নিঃস্তব্ধ! কী প্রাণ ছিল এই বাড়িতে, জীবনের কী উচ্ছ্বাস ছিল, প্রাণের কী প্রাচুর্য ছিল সর্বত্র। এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছুটিতে বাড়িতে এসে উঠোনে মোড়ায় বসে থাকা বাবার সেই বলিষ্ঠ, শান্ত-সৌম্য চেহারা, রান্নাঘরে আগুনের তাপে আম্মা আর দাদীর ঘর্মাক্ত শরীর, স্নেহভরা সেই হাসিমাখা মুখ। পুরো পৃথিবীর ভালোবাসা যেন উপচে পড়ত ওই চির প্রিয় মুখ গুলোতে। রংধনুর সাত রঙের আবির মাখা ছিল আমাদের সেইসব সোনালি সময়, হঠাৎ গত হয়ে যাওয়া সময়ের কালো মেঘের আড়ালে যেন চলে গেছে, সেই না-ফেরা রংধনুকাল কখনো আসবে না ফিরে আর।

জীবনের নির্মল আনন্দ-উল্লাস, বন্ধুবাৎসল্য, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, সম্প্রীতি, প্রতিবেশীপ্রেম, আত্মীয়দের স্নেহ-মমতা, গুরুজনদের আশীর্বাদ সবই এসেছে জীবনের অংশ হয়ে, অথচ সময়ের আবর্তনে হারিয়ে গেছে সেই অমূল্য সময়, ছেলেবেলার সেই সুন্দর জীবন। সুস্থ জীবনধারার বিশুদ্ধ বাতাস বইতো আমাদের সেই সময়ের পারিবারিক ও সামাজিক বলয়ে, কী গভীর ছিল আত্মার বন্ধন! কি অদ্ভূত সুন্দর ছিল আমাদের ছেলেবেলাটা। আহারে, আহারে। হটাৎ খেয়াল হোল ভীষন বৃষ্টি শুরু হয়েছে সিডনীতে। আজকে এই বৃষ্টি আর মেঘ গুলোকে কেন যেন খুব আপন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা যেন আমাকে সেই ফেলে আসার সময়ে টেনে নিয়ে যেতে এসেছে। আমার কানে তখন বাজছে–

" পরদেশি মেঘ যাও রে ফিরে।

বলিও আমার পরদেশি রে।।

সে দেশে যবে বাদল ঝরে

কাঁদে না কি প্রাণ ,একেলা ঘরে,

বিরহ ব্যথা নাহি কি

সেথা বাজে না বাঁশি, নদীর তীরে।। „

কাশ ফুলের খোঁজে

-অনুরাধা মুখোপ্যাধ্যায়

অতীতের স্মৃতি আর কিছু কথা
আমাকে যেন পাঠালো কে ঠেলে
কাশ ফুলের খোঁজে
অনেক দূরে
মনের রাস্তা ধরে
সামনের কেয়ারী করা লন
হলো গ্রামের মেঠো পথ
আর আমি মন গড়া রাস্তায়
ছুটে চলি
নগ্ন পায়ে পরে লাল ডুরে
এলো চুলে নূপুর বাজিয়ে
ওই কাশ ফুলের খোঁজে
ওই দূরে
সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো
মেঘ যায় আমার সঙ্গে আর
সোনা রোদ ঝিলিক দেয়
সবুজ টিয়ার ডানায়
ওই মাঠ এর দিগন্তে
আর আমি খুঁজে চলি
স্বপ্নের মেঠো পথ ধরে
এক মুঠো কাশ ফুল
ওই দূরে কোন মনগড়া
সুদূরে

৯ই ফাল্গুন এবং বাংলা

-ডা: প্রভাত রায়

বাংলা কি শুধু মায়ের ভাষা
বাংলা কি শুধু বর্ণ
বাংলা মানে গভীর কিছু
বাংলা আমার ধর্ম

আমি বাংলার, বাংলা আমার
কতই সহজ প্রাণের বুলি
রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার তরে
নির্ভীক তাজা স্বপ্নের বলী

মুসলিম হল থেকে চামেলী হাউজ
মেডিকেল হোস্টেল আর ইডেনে
১৪৪ ধারা ভেঙ্গে কেঁপেছে স্লোগানে
নয়ই ফাল্গুনের মিছিলে

ছুটেছে বুলেট সাথে লাঠিচার্জ
শত নিপীড়ন বাংলার জন্য
ভাষা আন্দোলনের মহিমা
বিস্তৃত সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন

সালাম বরকত রফিক জব্বার
শফিউর সহ অনেকে
প্রাণের রক্তে রঙিণ করেছে
ভাষা আন্দোলনের পথকে

মাতৃভাষার ত্যাগের ইতিহাস
শুধু বাঙালী জাতীরই গর্ব
ধন্য ধন্য ভাষা শহীদেরা
তোমাদের বিনিময়ে বাংলা বর্ণ

***১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ৮ই ফাল্গুন ছিল... কিন্তু পরবর্তীতে পহেলা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিল ধার্য করায় তা ৯ই ফাল্গুনে পরিণত হয়... ***

বিশ বছর চলে গেছে

-ওয়াহিদ ইবনে রেজা

বিশ বছর চলে গেছে।
বিশ নাকি বিষ?
বুকের কষ্ট আজো
জানান দেয় অহর্নিশ।
এ কেমন কথা?
বেদনার ব্যাথা,
নিয়ে এ কেমন
জীবন যাপন?

আহারে সময়
কত না ক্ষতই
ফুরায়, তবু বিশ বছরে
সেই পুরোনো ক্ষত
বয়ে চলে যেন কোন
ভুলে যাওয়া নদী!
খানিক ডুবায়
খানিক ভাসায়।

বিশ বছর চলে গেছে।
বিরহ মালা সেজে
শিকল দিয়েছে পায়ে
আজ বহুদিন।
পাখি উড়ে গেছে
দিক চিহ্ন বিহীন।
পথে, রাস্তায়, একলা
ল্যাম্পোস্ট,
সামনে এরকম
আরও কিছু দিন!
আরও,
কতটা দিন?

দুটি কবিতা

-জোবায়ের স্বপন

ভাবনানামা – ৮
আমার একটা
গন্তব্য ছিল - ' তুমি '!
তোমারও গন্তব্য আছে তাই
বারবার তোমাকে হারাই
ভুল পথে ক্লান্ত হই -
নিজের অজ্ঞাতে বারবার
নিজের দরজায় এসে দাড়াই - -
এবং আমার একটাই
গন্তব্য থাকে - ' তুমি '!!!

ভাবনানামা - ১৯
সোনার কাঠি
রূপার কাঠি নেই
রাজকন্যা - ঘুম ভাংগে না!
পাশ ফিরে শোয় - -
সূর্য ঢাকা মেঘ
ম্লান আলোর বার্নিশ
যুবক - ঔজ্জল্য হারায় - -

লোডসেডিং অবিরাম
দৃশ্যপট বদলে যায়!!!!

Cancer > Love

-Adiba Faruque
(In memory of her loving grandmother)

From a generation old
Her love was untold
With a beacon of hope in her hand,
She took her very last stand
For cancer is winning its battle against man

Now all I have left is a string of lustrous spherical masses,
with me always, through all my classes
Inside each tiny white ball, grasps the memories and laughter unspoken
How can I win against this heart that is broken?
For my friend cancer is still winning its battle against man

My mother's tears fill our abode
But after many grey halfmoons we come to a crossroad,
The endless nights start to decrease
And my mind is trying to find peace
And cancer is thrashing its war with man

শারদীয়া

-আমেনা বেগম ছোটন

বিকেল ৫ টায় অফিস থেকে বের হয়ে বাসায় পৌছুতে আট টা বেজে গেল শুভর। বাড়িতে ঢুকতেই তার তিন বছরের মেয়ে সুপ্রভা বাবা বাবা বলে এসে জড়িয়ে ধরল। মেয়েকে নিয়ে কতক্ষণ লোফালুফি করল শুভ।

এগিয়ে এসে হাতের হটপট আর ব্যাগ নিল অদিতি - এত দেরি করলে যে?

- আর বল না, এত জ্যাম। বাস পেতে এক ঘন্টা আসতে দুই ঘন্টা। অফিসের কেউ এদিক টা থাকলে কয়েকজনে মিলে উবার নিয়ে চলে আসা যেত। এই জায়গায় আমি একাই থাকি। যন্ত্রণা।

-- থাক, সে আর বলে কি হবে? তুমি জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও, আমি খাবার দিই।

খাওয়া শেষে শুভ টিভির রিমোট নিয়ে বসল।

-- এবার বাসের টিকেট টা আগেই কেটে ফেলি কি বল? পরে দাম বেড়ে যায়।

-- হ্যা, ভালই হয়।

-- তুমি এখন থেকেই ব্যাগ সুটকেস গুছিয়ে রাখ, গতবার যা হাংগামা গেল শেষ কালে। বাড়ি গিয়ে দেখ, ফিডার নিতে ভুলে গেছ।

-- একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না কর?

--কি কথা? শুভ সতর্ক হয়ে যায়, নিশ্চয় ই ভাল কিছু না, নয়ত মনে করাকরির কথা আসছে কেন?

-- এবার পুজোটা আমি নারায়ণগঞ্জ গিয়ে করি? মায়ের সাথে?

-- কি যে বল। আমার মা কি ভাববে? এম্নিতেই আলাদা সংসারে থাকি। একটা পুজো, সেটাও যদি শশুরবাড়িতে করি, কেমন দেখায়?

-- তুমি বিক্রমপুর যাও, আমি সুপ্রভা কে নিয়ে নারায়ণগঞ্জ যাই।

-- বউ ছাড়া গেলে লোকে বলবে কি? তাছাড়া আমার মা বাবা নাত্নীকে দেখতে চাইবে না?

অকাট্য যুক্তি। অদিতি দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বল্ল, বেশ, টিকেট কেটে ফেল। আমি গোজগাছ করি।

এ মা, ১০ টা বাজে। সুপ্রভা, ঘুমাতে আয় মা। তুমিও দেরি কর না। কাল অফিস আছে ত। বিছানার ঝাড়ু, মশারি, সুপ্রভার ওয়েল ক্লথ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় অদিতি।

শুভ আরো দীর্ঘ বিতর্ক যুক্তি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিল, হঠাৎ অদিতির এমন রণভংগে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। যাহ বাবা, এমনি ঘর বার, অফিস বাজার করতে জান যায়, এদিকে বউ শুরু করেছে নারীবাদী আর্টফিল্ম। অদিতি তেমন মুখরা রমণী নয়, বেশি বায়না টায়না নেই। তাই কিছু চাইলে না করতে কোথায় যেন বাধে।

শুভ সুলতান সুলেমান দেখে। হেরেমের মহিলা রা কখনো বাপের বাড়ির নাম নেয় না, সুখেই আছে সুলতান সুলেমান।

রাতে মৃদুস্বরে অদিতিকে জিগেস করে শুভ, মন খারাপ হয়েছে তোমার?

-- নাহ। তুমি হ্যা বলবে এ আশা ছিল না।

-- তাহলে শুধুশুধু জিগেস করলে কেন?

-- এম্নিই। যদি হ্যা বলে ফেল। ভবিষ্যৎ এ কোন এক সময় আমার হয়ত মনে হত, যদি সাহস করে বলে ফেলতাম, তুমি হয়ত রাজি হয়ে যেতে। আমি মা বাবার সাথে পুজো করতে পারতাম। এখন ভাবব, আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠেনি। তুমি মন খারাপ কর না, ঘুমাও। সকালে অফিস লেট হবে।

-- হু। দেখি, আগামী বছর তোমাকে পাঠানো যায় কি না।

-- আচ্ছা।

অদিতির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরে। নিঃশব্দে কাদে সে। অনুযোগ করা স্ত্রী স্বামী রা পছন্দ করে না। কেমন ভয়ভয় লেগেছে আজ সারাদিন।

আজ সকালে মঞ্জলা ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, এ বছর দেশে এসে মায়ের সাথে পুজা করবে বলে টিকেট কেটেছিল।

মাসীমা গতকাল হার্ট এটাকে মারা গেছেন।

প্রকৃতি হন্তারক মানুষ

-শহিদুল ইসলাম

রাস্তায় একটি মৃত হাতি পড়ে আছে। পুরুষ হাতি। তার শুঁড় ও দাঁত কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। মানুষের এই নৃশংসতা দেখে অনেকে নানা রকম মন্তব্য করেছে। মানুষ এই নৃশংসতার নিন্দা ও ক্ষোভে ফেসবুক ভরে তুলেছে। অন্য এক জায়গায় রাস্তার ওপর মরে পড়ে আছে একটি স্ত্রী হাতি। গাড়ির ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়েছে। ক্রেনে করে হাতিটিকে সরিয়ে নেওয়ার সচিত্র খবর এসেছে ফেসবুকে। হাতির দাঁতকে বলে গজদন্ত। , ইংরেজিতে আইভরি, । আমরা এর বিশাল মূল্য ধার্য করেছি। যা কিনা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। একটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী হাতি মেরে গজদন্ত, নিয়ে বিদেশে চালান দেয়। আফ্রিকায় এই ব্যবসা রমরমা। ট্রাক ভর্তি করে দাঁতগুলো জাহাজে তুলে দেয় পশ্চিমা সভ্যতার সভ্য, মানুষগুলোর জন্য। চড়া মূল্যে তারা সেগুলো কেনে। এক শ্রেণির শৌখিন দুর্বৃত্ত আছে, যাদের ড্রয়িং রুমের শোভা বৃদ্ধি করে দেয়ালজুড়ে থাকা বাঘ-সিংহ-হরিণের চামড়া, হরিণের দুটি শিং, হাঙ্গরের দাঁত, সাপের চামড়া ইত্যাদি জংলি পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ। তা ছাড়া খুলনা-যশোরের বিভিন্ন হোটেলে উন্মুক্তভাবেই হরিণের মাংস বিক্রি হয়। জংলি প্রাণী হত্যা করা এবং গাছ কাটা আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু তা বন্ধ করা যায়নি। সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর কাছ থেকে সেগুলো কিনে আপনিও তাদের দলভুক্ত হলেন এবং আইন ভঙ্গ করলেন। এই শৌখিনতা প্রকৃতিবিরোধীই নয় শুধু, প্রকৃতি ধ্বংসাত্মক। একটি মাংসাশী প্রাণী, একটি হরিণ বা জেব্রা শিকার করে তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। এটা প্রকৃতিরই অংশ। আর আমরা আমাদের শখ মেটানোর জন্য বন্য পশু হত্যা করছি। আমরা নাকি সভ্য? এভাবে একটি হাতিকে হত্যা করে `গজদন্ত` চুরি করা কোনো মাপকাঠিতেই সভ্য মানুষের কাজ হতে পারে না।

দুই.

কিছুদিন হলো আমি সভ্যতার অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ নিয়ে ২০১৮ সালে বিশ্বদর্শন বছরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের আমন্ত্রণে একটি প্রবন্ধও পাঠ করে এসেছি। সভ্যতা বা অসভ্যতার ওপর বিশ্ববিখ্যাত বই লুইস হেনরি মর্গানের আদিম সমাজ, উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতে মানুষের অবস্থানকে তিনি তিনটি শাখায় বিভক্ত করেছেন: অসভ্য, বর্বর ও সভ্য। কিন্তু বায়োলজিক্যাল গঠন আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা যায় অসভ্য ও সভ্য মানুষের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য সামাজিক। সমাজ সৃষ্টির পরই সভ্য, অসভ্য, বর্বর'এ শব্দগুলো আমাদের মুখে স্থান করে নেয়। মর্গান বিষয়টি ঠিকই উপলব্ধি করেছেন। সরকার ও আইন করা হয়েছে মূলত সম্পত্তি সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও উপভোগ করার জন্য। যেখানে সম্পত্তি করাই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেখানে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ এই ধরনের একটি উদ্দেশ্যের মধ্যে আত্মধ্বংসের উপাদান বিদ্যমান।মানুষ খারাপ নয়, বরং সম্পত্তির ধারণার মধ্যেই এই দুষ্ট বীজ বেড়ে উঠেছে। শিকারি আহরণের যুগে মানুষের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না। তাই সে সমাজ ছিল টেকসই। তাই মর্গান ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এর পরবর্তী উন্নত সমাজ, অবশ্যই হবে, প্রাচীনগণের স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পুনরুজ্জীবনমূলক। (এসব উদ্ধৃতি আমি বুলবন ওসমানে অনূদিত প্রাচীন সমাজের ভূমিকা থেকে গ্রহণ করেছি।) মর্গানের সে ভবিষ্যৎ সম্ভবত সত্যি হতে চলেছে। ১৮৬০ সালে কলকাতার উঠতি ভদ্রলোক শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন লক্ষ করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একেই কি বলে সভ্যতা? নামে একটি প্রহসন লেখেন। ১৯৩০ সালে সিগমন্ড ফ্রয়েড 'Civilization and its discontent' বইতে বলেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। সমাজের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে শাসক শ্রেণি যেসব আইন-কানুন রচনা করে, সেগুলো মানুষের সে সহজাত স্বাধীনতা পরিপন্থী। ফলে মানুষের সঙ্গে সভ্যতার, সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। মানুষের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা খর্ব করার নামই সভ্যতা,। রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালে লেখেন সভ্যতার সংকট,। ইংরেজ সভ্যতার ওপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। মনে করতেন ইংরেজ সভ্যতা একদিন সারা বিশ্বকে আলোকিত করবে। কিন্তু তাঁর সে বিশ্বাস কেন হারালেন, সে কথাই তিনি আমাদের জানালেন ওই প্রবন্ধে। তাঁর অনেক আগে মার্ক টোয়াইন (১৮৩৫-১৯১০) জানান যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের সীমাহীন পুনরুৎপাদনের নামই সভ্যতা। , কার্ল মার্ক্সও মনে করতেন যে কৃষিকাজ শুরু ও কতিপয় পশুকে পোষ মানানোর মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূচনা হয়। বিভিন্ন স্তর পার হয়ে সভ্যতা বর্তমান স্তরে পৌঁছে। কিন্তু সভ্যতা সম্পর্কে গত ১ মে ১৯৯৯, ডিসকভারি পত্রিকায় পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত নৃবিজ্ঞানী ও ক্রমবিকাশ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ জারেড ডায়মন্ড দীর্ঘদিনের গবেষণার পর একটি প্রবন্ধে বিশ্বকে নাড়া দেন। প্রবন্ধটির নাম Agriculture : The Word Mistake in the History of Man,. স্বভাবতই প্রবন্ধটি ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজও তাঁর যুক্তি কেউ খণ্ডন করতে পারেনি। আমি আশ্চর্য হলাম আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে রোমান কবি ওভিড (৪৩ খ্রি. পূ. ১৭ খ্রি.) মেটামরফোসেস, নামে ১১ হাজার ৯৯৫ লাইনের এক বিরাট কবিতায় বলেন যে মানুষ ধ্বংসাত্মকভাবে সৃজনশীল। চতুর মানুষ তার আবিষ্কারের মাধ্যমেই নিজের ও সংরক্ষী পৃথিবীর সব প্রাণ ও উদ্ভিদের ধ্বংস ডেকে আনছে। আমরা আজ ভুলে গেছি সভ্যতার (?), সূচনার আগে আমরা বনবাদাড়ে জংলি ফলমূল আহরণ ও জংলি পশু শিকার করে আমাদের অস্তিত্বের ৯৯ শতাংশ কাটিয়েছি। ওভিড আমাদের সেসব কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। ১৮ মে ২০১৯ শনিবার একটি দৈনিক পত্রিকা শেষ পৃষ্ঠায় তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজে একটি জংলি বাদামগাছের ছবিসহ খবর ছেপেছে। পত্রিকার কাছে মনে হয়েছে এটি একটি দুর্লভ ঘটনা। মানুষের জন্মের আগেই তো উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্ম হয়। ধর্ম ও বিজ্ঞান এখানে একমত। মানুষের সেবা-শুশ্রূষা ছাড়াই যে কোটি কোটি বছর আগে যেসব গাছপালা জন্মেছে, সেসব গাছে ফুল-ফল ধরেছে। প্রকৃতি মানবনিরপেক্ষ'বলেছেন আইনস্টাইন। আজও এর

বিরাম নেই। গভীর জঙ্গলে কিংবা জনমানবশূন্য দ্বীপে সবই জন্মাচ্ছে। দুই হাজার বছর ব্যবধানে ওভিড ও ডায়মন্ড একই রকম চিন্তা করেছেন, ভাবতেই অবাক লাগে। দুই হাজার বছর আগে ওভিড কিভাবে বুঝতে পারলেন যে মানুষের তৈরি সভ্যতাই একদিন মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবে?

দুই হাজার বছর আগে ওভিড কি সভ্যতার, শরীরে বসন্তের গুটিগুলো লক্ষ করেছিলেন? ১৮১৮ সালের ১ জানুয়ারি মেরি শেলির বিশ্ববিখ্যাত ফ্রাংকেনস্টাইন, উপন্যাসটির পরিণতির কথা চিন্তা করুন। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে আমরা যে অপ্রাকৃতিক সভ্যতা গড়ে তুলেছি, সে সভ্যতা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন।

তিন.

প্রতি দুই বছর পর পর বিশ্ব বন্য প্রাণী ফান্ড, (WWF) তার প্রতিবেদন পেশ করে। সেখানে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হয়। বিগত দুই বছরে জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আমাদের চাহিদার চাপ এবং তার ফলে প্রকৃতি ও বন্য প্রাণের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) ওপর তার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে। এন্ড্রি পিন্টু কর্তৃক প্রকাশিত গত ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের প্রতিবেদন বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে খুবই সংকটজনক খবর দিয়েছে। পৃথিবীর অবস্থা প্রতিদিন খারাপতর হয়ে পড়ছে। ২০ লাখ বছর ধরে হোমো, প্রজাতি পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাস করে আসছে। কিন্তু গত ৪৪ বছরে আমরা যা অর্জন (?) করেছি, আগে কখনো তেমনটি হয়নি। একই প্রকৃতির অংশ হিসেবে অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর সুবিচার তো করতেই পারিনি, আমরা তাদের প্রতি মুহূর্তে হত্যা করে চলেছি। একে গণহত্যা বললেও ভুল বলা হয় না। ১৯৭০-২০১৪ সালের মধ্যে আমাদের কর্মতৎপরতার জন্য পৃথিবীর ৬০ শতাংশ স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, মাছ, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী নিঃশেষ হয়ে গেছে। চতুর মানুষই এর জন্য দায়ী। আমরা গণহত্যায়, লিপ্ত। লিভিং প্ল্যানেট রিপোর্ট ২০১৮ প্রমাণ করে যে পৃথিবীর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে। সংক্ষেপে এবারের প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বাস্তবতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে:

* গত ৫০ বছরে আমাজন নদীর ২৫ শতাংশ হারিয়ে গেছে।

* ২০০০-২০১৩ সালের মধ্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্ত বনের পরিমাণ ৯২ মিলিয়ন হেক্টর।

* ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পর যত প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার ৭৫ শতাংশের জন্য দায়ী প্রকৃতির ওপর অত্যধিক শোষণ ও কৃষিকাজ।

* সমুদ্রের জল যত দ্রুতগতিতে অম্লায়িত (Acidic) হচ্ছে, গত ৩০০ মিলিয়ন বছরে এমনটি দেখা যায়নি। গত ৩০ বছরে অগভীর জলের কোরাল ৫০ শতাংশ হারিয়ে গেছে।

* প্রতি ১০ বছরে পৃথিবীর বাতাসে ১০০ বিলিয়ন টন কার্বন মিশিয়ে দিচ্ছে মানুষ। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে বাতাসে CO_2 গ্যাসের পরিমাণ গড়ে ৪১০ পিপিএমে পৌঁছে, যা বিগত আট লাখ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

* পৃথিবীর মাত্র ২৫ শতাংশ জমি মানুষের তৎপরতার বাইরে আছে। ২০৫০ সালের মধ্যে তার পরিমাণ ১০ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রকৃতির ওপর আমাদের নির্ভরশীলতা বাড়ছে, বাড়তেই থাকবে। এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে প্রকৃতির ওপর আমাদের একাধিপত্য ভালো ফল বহন করে আনেনি'আনছে না। তবে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা অত্যন্ত জরুরি। তাই গত ২৬ এপ্রিল ২০১৯ গারেথ হাচেস (Gareth Hutchens) দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান পত্রিকায় লিখেছেন যে আমাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন `কেন্দ্রবিন্দুতে, স্থান লাভ করেছে। ডেভিড অ্যাটেনবরো বলেছেন যে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঠেকাতে হবে। ইনস্টিটিউট ফর নিউ ইকোনমিক থিংকিংয়ের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিজ ও রব জনসনের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস এক নতুন অর্থনৈতিক চিন্তার গুরুত্বের প্রসঙ্গে (১৩ মে ২০১৯)। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশের বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে, জলীয় আধার ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে মানুষের তৎপরতার জন্য। সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ইউনেসকো। আগামী ৬০ বছরের মধ্যে সুন্দরবন বাঘশূন্য হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

উন্নয়নই অতীতের সব সভ্যতা ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়েছে। উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের সংযোগ খুবই দৃঢ়। তাই উন্নয়ন অর্থনীতির সঙ্গে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির সংযোগ ঘটানো অতি জরুরি। মনে রাখতে হবে, যেখানে ১০ জন মানুষ একত্র হয়, সেখানকার পরিবেশই দূষিত হয়ে পড়ে। তাই মানুষ, উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়।

লেখক: সাবেক অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Drawing by: Srija

ভগবান কোথায় থাকেন?

-তন্ময় দেব নাথ

ভগবান কোথায় থাকেন? সনাতন ধর্মীয় দর্শনের অনুসারীগণ এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গিয়ে, যে যার মত করে ভগবানের বাসস্থান কে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বলে উল্লেখ করে থাকেন। কেউ বলেন ভগবান থাকেন আকাশে, কেউ বলেন স্বর্গ রাজ্যে বা কৈলাশে, নানা ধরণের মন্দিরের লোকজনেরা বলেন কেবল তাদের মন্দিরেই থাকেন, কেউ বলেন মানুষের অন্তরে, আবার কেউ বলেন ভগবান সবকিছুতে। এদের প্রত্যেককে প্রমাণ দেখাতে বললে কেবল বিশ্বাস এর দোহাই দিয়ে আপনাকে চুপ করিয়ে দেবে। আবার এদেরকে যদি সামনাসামনি বসিয়ে দিয়ে আসলে কোনটা ঠিক তা আলোচনা করে নির্ধারণ করার জন্য বলা হয় তাহলে মহা গন্ডগোল বাধিয়ে দেবে সবাই। তবে কি এই আপাত গোলমেলে বিষয়টির কোনো পরিষ্কার উত্তর নেই কারো কাছে?

আছে। কিন্তু, এই বিষয়টি আলোচনা করার আগে একটু পটভূমি তে যাওয়া দরকার। ধর্ম আর ভগবান নিয়ে আমাদের যে জ্ঞান তার উৎস কি? হয়তো আমরা আমাদের পরিবারের কারো কাছে থেকে শুনে বা দেখে শিখেছি, নয়তো পাড়ার গোসাই যা বলেছেন তাই শুনেছি, অথবা কোনো দর্শনধারী সাধু বাবা, বা অমুক তমুক বাবা যা বলেছেন তাই একেবারে প্রকৃত সত্য বলে আগলে বসে আছি, বা সনাতন ধর্মের বিভিন্ন মত-দর্শন থেকে এবং পূজা পার্বন দেখতে দেখতে নিজের মতো করে একটা ধারণা তৈরী করে নিয়েছি। ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী কেউ বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে, শাস্ত্র বলেছে অথবা এই বাবা সেই গোসাই এর মতাদর্শ বলে নিজের মত করে একটা কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি।

এই অদূরদর্শী শোনা কথার উপর দাঁড়িয়ে যাওয়া বিশ্বাস এর কারণে কতগুলো ভুলের সৃষ্টি হচ্ছে, আর অন্যান্য ধর্মমতে বিশ্বাসীরা সনাতন ধর্ম আর ভগবানকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়ে বিষয়টাকে হাস্য রসে পরিণত করার সুযোগ পাচ্ছে। আর অন্য দিকে সনাতন ধর্মের বহু মতের অনর্থক অর্থ করে করে তা দিয়ে ধর্ম ব্যাবসায়ীরা (গোসাই, বাবা, এক শ্রেণীর পুরোহিত ও রাজনীতিক) নিজের ব্যাবসা জমিয়ে বসেছে।

এবার মূল বিষয়ে ফিরে যাই. সাত হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো আমাদের সনাতন ধর্মীয় দর্শন। এই দীর্ঘ সময় পার করতে করতে বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা আর মতবাদ মতভেদে বিভক্ত হতে হতে মূল দর্শনটি ছয়টি প্রধান শাখা দর্শন এ বিভক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মূল দর্শন টি এসেছে বেদ আর উপনিষদ কে কেন্দ্র করে। সনাতন ধর্মীয় দর্শনের সবচেয়ে শক্তিশালী যে শাখাটি আজ পশ্চিমা বিশ্বেও সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য এবং মেটাফিজিক্স এর সাহায্যে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা হলো অদ্বৈত বেদান্ত। প্রাচীন মহর্ষি থেকে শুরু করে, শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকান্দ বা সাম্প্রতিক স্বামী অভয়ানন্দ এবং অন্যান্য ধর্মমত এ বিশ্বাসী যারাই ভগবান কে প্রত্যক্ষ করেছেন তারা সকলেই একই কথাই বলেছেন, ভগবান বা ঈশ্বর হচ্ছে শুদ্ধ চৈতন্য (পিওর এনার্জি) আর বিশ্ব ব্রম্মান্ড হচ্ছে তার চিন্তার প্রতিফলিত রূপ মাত্র (ক্রিয়েটিভ এনার্জি) এবং তারা মোটামুটি সকলেই আধ্যাত্মবাদী এবং অদ্বৈতবাদী । ভগবানকে দর্শন করা যায় না, তাকে কেবল ধ্যান-এ উপলব্ধি করা যায়। কেউ যদি বলেন যে ভগবান এর কোনো নির্দিষ্ট চেহারা দেখেছেন তা হলে সেটা কেবল উপরি উক্ত যে কোনো একটি গোলমেলে শ্রেণীর কাছে থেকেই আশা করা যায়। প্রকৃতই যারা ভগবান কে জেনেছেন তারা কখনোই এই ধরণের কথা বলবেন না।

এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড এবং তার প্রতিটি সৃষ্টি সেই শুদ্ধ চৈতন্যের রূপান্তরিত রূপ বা তার ক্রিয়েটিভ এনার্জি দ্বারা সৃষ্টি এবং আশ্চর্জজনকভাবে সেই শুদ্ধ চৈতন্যে-ই অবস্থিত। তাই এই জাগতিক বা মহা-জাগতিক সমস্ত কিছুই ভগবানের রূপান্তরিত রূপ যা পরোক্ষ ভাবে ভগবান। পার্থক্য এটাই যে, শুদ্ধ চৈতন্য বা মূল আধার – অদর্শনযোগ্য এবং স্থায়ী, আর রূপান্তরিত রূপ বা বিশ্বজগৎ - দৃশ্যমান এবং অস্থায়ী। সুতরাং ভগবানের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই বরং যে রূপেই তাকে কল্পনা করা হোক না কেন সেটা তার-ই রূপ হতেই হবে।

তাহলে হিন্দু যে মন্দিরে যায় আর দেবতার পূজা করে এটা করা কি মিথ্যা বা ভুল। স্বামী বিবেকানন্দ "পার্লামেন্ট অফ দি ওয়ার্ল্ড রিলিজিওন„ এ ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তে খুব চমৎকার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন । তিনি বলেছেন, "আমরা যখন কিছু চিন্তা করি, প্রথমে তার একটা প্রতিচ্ছবি মনে তৈরী হবে। আর তারপর ল অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী মনের ওই প্রতিচ্ছবিই বস্তু ভিত্তিক প্রতিচ্ছবি তে পরিণত হবে অথবা তার ঠিক উল্টোটা।" তাই সাংখ্য, বৈষ্ণব বা যোগ দর্শন এর অনুসারীরা তাদের চিন্তার প্রতিফলন অনুযায়ী মনে তৈরী ভগবান এর মানসিক প্রতিচ্ছবির বাহ্যিক আকৃতিকেই পূজা করে থাকে। স্বামীজী আরো বলেছেন, "এই প্রতীক তাকে তার মন কে ভগবান এ স্থির করতে সাহায্য করে. যেমন তোমরা (পিপল ইন দি অডিটোরিয়াম) ভাবছো, তেমনি বেশিরভাগ হিন্দুও জানে যে, ভগবান তার ওই আকৃতির মতো নয়।" জগতের সাধারণ মানুষের জন্য ভক্তির প্রথম স্তরে এই বাহ্যিক রূপ বা মূর্তি পূজা, ভক্তের অন্তরে পরবর্তী স্তরে `পরা, ভক্তির দ্বার উন্মোচন করে দিতে পারে। সুতরাং এটি মোটেও ভুল পথ নয়, বরং যারা এই বিষয়ে অসহিষ্ণু তারাই ভুল।

সনাতন ধর্মের অনুসারী যারা ভগবান কে উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) করেছেন তারা বলছেন, ঈশ্বর সমস্ত জীবের ভিতর শুদ্ধ চৈতন্য রূপে বিরাজিত। আর ম্যাটেরিয়াল ইউনিভার্স এর সমস্ত কিছুই তার ক্রিয়েটিভ এনার্জির ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র, মেটাফিজিক্স এ যাকে বলে মূল অপরিবর্তনীয় শক্তির রূপান্তরিত ভিন্ন ভিন্ন অস্থায়ী অবস্থা। তাই মন্দির যেমন ভগবানের রূপান্তরিত শক্তি (পদার্থ) দিয়ে তৈরী, মূর্তিও তেমনই। সমস্ত জীবের চৈতন্য শক্তি যেমন ভগবান, তেমনি বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের আধার যে মহাশূন্য তাও সেই অপরিবর্তনীয় অদৃশ্য শক্তি বা ভগবান, আবার বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের যে জাগতিক দর্শন যোগ্য রূপান্তরিত শক্তি/বস্তু তাও সেই ভগবানই।

বর্তমান সময়ের ঈশ্বর প্রত্যক্ষকারি একজন আধ্যাত্মবাদী, স্বামী অভয়ানন্দ (১৯৩৮ খ্রী:) যেমন বলেছেন, "ভগবানকে দর্শন করা যায় না, তাকে কেবল চৈতন্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, একমাত্র সেই মূলশক্তি যখন নিজেই উন্মোচিত হয়"। সে কোনো চেহারা নিয়ে প্রকাশিত হয় না, তার প্রকাশে কেবল জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার একাত্মতা উপলব্ধি হয়।

তাই ভগবানকে মন্দির, মূর্তি, অন্তরীক্ষ, কৈলাশ বা স্বর্গ রাজ্যের সিংহাসনে দেখা যাবে না। ভগবানকে পাওয়া যাবে নিজের অন্তরে ওই চৈতন্য বা আত্মা রূপে, একথা বলেছেন বৈদিক ঋষি কপিল (৯০০-৮০০ খ্রী:পূ:) থেকে শুরু করে লাও টেজ (৬০১ খ্রী:পূ:), পিথাগোরাস (৫৭০ খ্রী:পূ:), সক্রেটিস (৪৬৯ খ্রী:পূ:), ফিলো (২০ খ্রী:পূ:), জেসাস অফ নাজারেথ (৬-৪ খ্রী:পূ:), প্লটিনাস (২০৫ খ্রী:), শঙ্করাচার্য (৬৮৬ খ্রী:), দত্তাত্রেয়ই (৯০০ খ্রী:), রুমি (১২০৭ খ্রী:), জনদেশ্বর (১২৭১ খ্রী:), নিকোলাস অফ কাঁসা (১৪০০ খ্রী:), দাদু (১৫৪৪ খ্রী:), শ্রী রামকৃষ্ণ (১৮৩৬ খ্রী:), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩ খ্রী:) এবং অসংখ্য অধ্যাত্মবাদী যারা ঈশ্বর কে উপলব্ধি (প্রত্যক্ষ) করেছেন।

গ্রিক গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক পিথাগোরাস (৫৭০ খ্রী:পূ:) বলেছিলেন, "নিজেকে জানো, তাহলে এই বিশ্বব্রহ্মান্ড এবং ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে

পারবে"। "নিজেকে জানো" এই কথাটিকে অনেকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে থাকেন; মানে - তোমার সম্পদ, যোগ্যতা, পদবি, ক্ষমতা সম্পর্কে জানো। সেটি মোটেই ঠিক নয়, বরং, তোমার মূল উৎস (শুদ্ধ চৈতন্য) কে জানো। যদি কেউ বলেন, আমি তোমাকে ভগবান দেখাবো, তাহলে তিনি একশ ভাগ মিথ্যা কথা বলছেন। কেউ কাউকে ভগবান দেখাতে পারবেন না। ভগবান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে কেবল নিজেই ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব, এই ক্ষেত্রে প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানী একজন গুরু কেবল প্রকৃত জ্ঞান লাভে সহযোগিতা করতে পারেন, ভগবান দেখাতে পারবেন না।

যারা ভগবানকে উপলব্ধি/প্রত্যক্ষ করেছেন (এনলাইটেনড) তাদের নিকট থেকে ভগবান সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তারপর ভগবান কোথায় তা নিজেই জানার চেষ্টা করতে হবে (কোনো বাবা, গোঁসাই বা সবজান্তার নিকট থেকে নয়), তাহলেই জানতে পারবেন যে ভগবান নিজের ভিতরেই চৈতন্য রূপে অবস্থান করছেন, আবার আপনি নিজেও সেই শুদ্ধ চৈতন্য ভগবানেই অবস্থান করছেন।। কোনো মন্দিরে গিয়ে পুরোহিত এর সাহায্যে ভগবান কে ডাকিয়ে, কৈলাশে বা অন্তরীক্ষে খোঁজ করে ভগবান কে পাওয়ার একেবারেই কোনো সম্ভাবনা নেই (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ৫০০ খ্রী:পূ:)।

খন্ডচিন্তা

-স্বর্ণা আফসার

এক:

মুখবই/ফেইসবুক যুগান্তকারী এক সামাজিক মাধ্যম। এক দশকের বেশি সময় ধরে একনাগাড়ে আধিপত্য বিস্তার করা এই deficiency সময়ে একেবারে কম কথা নয়। লাগাতার তথ্য আর তত্বের আক্রমণে রাতের বেলায় দিনে কি খেয়েছিলাম মনে পড়েনা। বলা বাহুল্য অনেক তথ্যের সূত্র ফেইসবুক। কিছু কিছু জিনিস না জানাই হয়তো ভালো ছিল। দূরত্বে আকর্ষণ বাড়ে।

কাউকে কাউকে ফেইসবুক এ বন্ধু হিসাবে যোগ করা আর নিজের জগতে বিনা খরচে সি সি টিভি, ক্যামেরা বসানো একই কথা। কেউ কেউ পাপারাজি হিসাবে হাতটা যাচাই করে নেয়ার জন্য এই কানের কথা ঐকানে, আর ঐকানের কথা এইকানে করেই পার করে দেন অলস দুপুর সন্ধ্যা। কেউ কেউ ঘুম থেকে উঠেই পর্দার বাইরে ঘাসের ফুল, খোলা চুল, বাঁধা চুল, ঝোলানো দুল, ভাত, ভর্তা, আলু সিদ্ধের আগে ও পরে, খোকন পড়ে যাওয়ার আগে ও পড়ে অনর্গল সম্প্রচার করতে থাকেন, সবই আমার মনে হয় তদুপরি লাইভ হওয়ার আর বিরাম কোথায়? অবিরাম লাইভ টেলিকাস্ট চলছে।

ফেইসবুক যে শুধুই আত্মপ্রচারে উন্মুখ জনগণের আর বিনা পয়সার গোয়েন্দাদের একার তা কিন্তু নয়। এটিকে প্রতিবছর নতুন উদ্ভাবনী আর আকর্ষণীয় করে মানুষের কাছে নিয়ে আসে ওদের ক্রিয়োটিভ টিম। খুব চমৎকার একটা বিষয় হলো মেমোরিজ। আগের ছবি, মানুষ সব দিন তারিখ গুণে সামনে নিয়ে আসে. জগতের সকল প্রাণী জন্মদিন ভুলে গেলেও ফেইসবুক কখনো ভোলেনা। দেশের মানুষদের মনে পড়ছে, ওদের আপডেট দেখা যায়, ফোন করে কথা বলা যায়। হার্ডড্রাইভ ক্রাশ করতে আমার মেয়েটার ছোটবেলার ছবি সব হারিয়ে ফেলেছি, ফেইসবুকে তুলে দেয়া ছবিগুলোই শেষ ভরসা। দোষ কিন্তু যোগাযোগ মাধ্যমের নয়, দোষ যোগাযোগকারীর নিজের।

মাঝে মাঝে ভাবি, আহা ফেসবুকে যদি কোথাও আসলেই বই থাকতো, মানবের কতইনা উপকার হতো। এই সামাজিক মাধ্যম মানুষকে যে কত অসামাজিক করে দিচ্ছে, তা আসলে উপলব্ধির বাইরে। একদিন স্মার্টফোনে ভুল করে বাড়িতে রেখে গিয়ে অথবা ভুলে যাওয়ার ভান করে বেশি না, তিন চার ঘন্টা পার করুন, দেখবেন ম্যাট্রিক্স এর মতো আপনি জগৎ সংসারের অন্য একটা রূপ দেখতে পাবেন। এই যেমন পাশ দিয়ে সাই করে চলে যাওয়া গাড়ি চালানো ঝা চকচকে ছেলে মেয়েগুলো দিব্যি ফোন টিপছে! একবারও ভাবছেনা ভুল হলে কি হবে! কিংবা প্রামের মধ্যে জোরে কাঁদতে থাকা শিশুকে উপেক্ষা করে বাবা/মা ফোনে ডুবে আছেন। অবহেলায় একটা খেলনা বাম হাতে বাড়িয়ে আছেন। সেই খেলনা থেকে শিশু কম করে একহাত দূরে, আর অনুভূতি থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে। বাড়িতে অতিথি এসেছে, দরজা খুলছেন। কুশল বিনিময়ের বদলে অতিথি কানে বা হাতে ফোনে ডুবে আছেন। ছোট ছোট বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে খেলাধুলা কথাবার্তা বন্ধ করে যার যার স্ক্রিনে সময় পার করছে। চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে আছেন স্ত্রী। সারাদিন পরে সংসারের আলাপ করবেন বলে, স্বামী তখন স্ক্রিনে খেলা দেখছেন, কিংবা ইমেইল পড়ছেন। সামনে থাকা মানুষ চলে যাচ্ছে অনেকদূরে, আর ক্রমশ ছোট হতে থাকা পৃথিবী হাতের মুঠোয় এসে গ্রাস করে নিচ্ছে সময়। শিশুর কান্না, স্ত্রীয়ের দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘ থেকে ক্লান্ত হয়ে অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে।

সময় কিন্তু প্রতিশোধ ঠিকই নিতে জানে। বাইরের দেশে একা একা শিশুপালন কত কঠিন আমরা সবাই জানি। এই কঠিন কাজটা সহজ করতে আমরা হাতে ফোন, ট্যাবলেট, যা পারি ধরিয়ে পাঁচ, দশ, বিশ মিনিটের বিরাম নিই। বাচ্চাগুলোর কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিলাম সময় বাঁচানো স্ক্রিন। আবার এই বাচ্চাগুলো যখন বড় হয় তখন আমরাই আশা করি ওরা নিজেদের স্ক্রিনের জগৎ ছেড়ে আমাদের সাথে অনর্গল কথা বলবে, তর্ক বিতর্ক, জ্ঞান বিজ্ঞানের আলাপ করবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর সব থেকে জরুরি, কারণ এই পাঁচ বছরে মানসিক গঠনের শতকরা ৯৮ ভাগ সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সাময়িক অবহেলা, আজীবনের অভ্যাসে বদলে যায়।

ছেলেটা দুষ্টু, ওকে খেলতে দিন। মেয়েটা হরবোলা ওকে বলতে দিন। শৈশব খুব মধুর আজীবন আসবেনা। সুমনের গানের মতো 'বেপরোয়া বিচ্ছুরা শান্ত সুবোধ' হয়েই যাবে কালকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। চঞ্চল থেকে শান্ত হতে হতে ঝিনুক কুড়োনোর মতো ওরা কুড়িয়ে নেবে বেঁচে থাকার অক্সিজেন, অনেক অনেক ভালোবাসা, অখন্ড মনোযোগ, কিছু খেলার সাথী আর অনেক অনেক স্মৃতি।

দুই:

'যেটা ছিলোনা, ছিলোনা

সেটা না পাওয়াই থাক

সব পেলে নষ্ট জীবন'

সব পেলে আসলেই নষ্ট জীবন। না পাওয়ার মধ্যে কষ্টের সাথে সাথে একটা প্রত্যয় থাকে। সেই প্রত্যয় অর্জনের। সেই প্রত্যয় হেরে না যাওয়ার। যে কখনোই এই অনুভূতি পায়নি, সে জয়ের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারেনা। যে হারানোর ত্যাগ জানেনা, সে অর্জনের বিজয় মুকুটের ঠিক মাঝখানের নীলার মূল্য দিতে জানেনা। কথাগুলো ভাবছিলাম আমার শিশুদের ঘরে উপচে পড়া খেলনাগুলো গোছাতে গোছাতে। প্রায়ই পায়ের নিচে পরে থাকা

বার্বি পুতুলের চুলের ক্লিপ, কিংবা রকেট যানের লেগোর পিসে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়। এমন তীক্ষ্ণ বেদনা আমার গলার স্বরনালীর উচ্চতম প্রকোষ্ঠে অনুরণ জাগালেও ওদের ক্ষুদ্র প্রাণে কোনো ভ্রূক্ষেপই হয়না!

মনে পরে যায় আমার ছেলেবেলার কথা। একবাক্স রংপেন্সিল যেন সিন্দুকে লুকানো গুপ্তধন। staedtler এর এক বাক্স রং তো নয়, যেন জাদুর পেন্সিল। আঁকাবুকি শেষ করে বারোটা রং আছে কিনা মিলিয়ে দেখতাম। সাদা রংটা খুব বেশি ব্যবহার হতোনা, তাই ওটা বড় থাকতো। লাল, নীল আগে শেষ হতো। কারো কাছে যদি বারোটার বদলে ২৪টা পেন্সিল থাকতো, টিফিনে আমরা সবাই আয়োজন করে রংপেন্সিল দেখতে বসতাম। এই রং পেন্সিল পরে একটু বড় ক্লাসে ওঠার পরে হয়ে যায় জ্যামিতি বক্স! জ্যামিতি বক্সের ভাবই আলাদা। একেতো জ্যামিতি বক্স পেতে হলে একটু উপরের ক্লাসে পড়তে হয়। তার উপরে কম্পাস, চাঁদা, ত্রিকোণ রুলার এইসব অত্যন্ত ভালো লাগার জিনিস। জ্যামিতি বক্সের রং নিয়েও গবেষণা চলতো। গোলাপি, না সবুজ? আর কলম! কলমের কথা কি বলবো! প্রথমে আমাদের পেন্সিল এ লিখতে হতো। একটু বড় হলে ফাউন্টেন পেন। হাতের লেখার ঠিক ঠিকানা নেই। সুন্দর সাদা কাগজ নষ্ট না করে নিউজপ্রিন্ট কাগজে প্রাকটিস করতে হতো অংক আর হাতের লেখা। লেখাগুলোর জন্য ফাউন্টেন পেনে কালি ভরে, কালি ঝেড়ে, মেঝে আর হাত দুটোই সমান পরিমান কালো করে লিখতে বসা! লেখা মোটা হলে কি আফসোস! লেখার মাঝপথে কালি ফুরালো, আবারো কালি ভরা, কালি ঝাড়া, যার কিছুটা আবার পড়লো লেখার উপরে! কি ব্যস্তসমস্ত দিনকাল।

বলপয়েন্ট পেন তখন নতুন আসলো। কালি ভরতে আর ঝাড়তে হবেনা! তাতে আবার তিনটে রং! লাল, নীল,কালো! আমার বাবা মাঝে মাঝে বোর্ডের পরীক্ষার খাতা দেখতেন। খাতা দেখার জন্য লাল নীল পেন্সিল ছিল। প্রথম যেদিন একই পেন্সিলে দুই রং দেখলাম, সেদিন আমার বিস্ময়ের সীমা ছিলোনা। খাতা দেখা হয়ে গেলে সেই টু ইন ওয়ান পেন্সিল আমাদের দখলে থাকতো। পেন্সিল কাটা হতো ব্লেড দিয়ে। শার্পনার আমার কাছে অনেক বিস্ময়ের ছিল। হাত কাটার ভয় নেই। বিস্ময়ের ছিলো ইরেজারেও। এখন দোকানে গেলে সাথে লিপস্টিকের মতো ইরেজার দেখি, কলমের বাহারেরও শেষ নেই। এসব দেখে আমারি শৈশব বার বার যেন কড়া নাড়ে। বাচ্চাদের বিস্ময় নেই। এরা সব entitlement এর যুগের মানুষ। বিস্ময় কম।

একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। আমাদের ছেলেবেলায় পেন্সিলবক্সের খুব কদর ছিল। একবার ঈদে কাপড় না কিনে আমরা দুই ভাইবোন পিয়ানো ওয়ালা পেন্সিল কেস কিনলাম। সে কি সাধের বক্স! পিয়ানো বাজে! রাস্তা বাড়ি সেই বক্স দেখতে দেখতেই আমাদের সারা ফেরা। হাসি আর ধরেনা! খুশিটা অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হলোনা। একদিন স্কুল ছুটির সময় আমার ভাইকে অন্য ক্লাসের বড় একটা ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললো তোমার বোন ডাকছে। ভাই তখন ব্যাগ গোছাতে ব্যস্ত। বই, খাতা, কলম সরিয়ে সেই ছেলেটা পিয়ানো বক্স হাতে নিয়ে বললো, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি বক্সটা। বাকি সব জিনিস ব্যাগে গুছিয়ে যখন আমার ভাই দৌড়ে এসে আমাকে বললো কিরে তুই ডাকলি কেন? আমার তখন অবাক হওয়ার পালা! দৌড়ে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে ব্যাগ খুলে সেই পিয়ানোবক্স আর পাওয়া যায়নি। কতবার ব্যাগ ঝাড়া হলো, বক্স নেই! তখন হারানো জিনিস আবার নতুন করে বাবা, মায়ের কাছে চাওয়া যেতোনা।

আমরা যারা প্রবাসে বাচ্চাদের সকালে স্কুল এ নামিয়ে দৌড়ে দৌড়ে অফিস করে, ছুটির পরে দৌড়ে দৌড়ে বাসায় ঢুকে দিন কাটাই, তারা সবাই বাচ্চাদের ছোটোখাটো আবদার যথাসাধ্য পূরণ করে চলি। ফলাফল: ঠিক শ'য়ে শ'য়ে নয়, কখনো কখনো হাজারের কোঠায় পৌঁছে যায় রং পেন্সিল, কলম, ইরেজার, শার্পনার। দোকানে কিছু দেখলে আবদার ঠিকই করে বাচ্চারা। কিন্তু না চাইতে পাওয়ার মতো জিনিসগুলোর কোনোই যত্ন নেই। গাড়িতে উঠেই মোড়ক খোলা, বাড়িতে ফিরতে ফিরতে নতুনের আবেদন শেষ। পুরাতন কোনোমতে ঘরে এসে কোনো কোণায় পড়ে থাকে। এতো প্রাচুর্যে থাকার পরেও ওরা অন্যের কথা খুব সহজে ভাবতে চায়না। প্লেটে বিস্কুট ছয়টি, বন্ধু ছয়জন। একজন দুটো বিস্কুট নিলে তার বন্ধু বিস্কুট খেতে পাবেনা। এই ভাবনাটা ওদের মাথায় আসেইনা। ছোটদের কেন বেশি দিতে হয়, যার নেই তাকে কেন দিতে হয়, সেটাও ওদের জগতে ধোঁয়াশা প্রশ্ন। সংযম আর ত্যাগ জীবনের জন্য অপরিহার্য। আমরা নিজেরা ও আমাদের শিশুরা সবাই যেন ত্যাগী হতে পারি। আমরা একটু কম খেয়ে, একটু কম আরাম করে যদি অন্যের উপকারে আসতে পারি, সেই চেষ্টা আমরা তাহলে কেন করবোনা? সবাই মিলে ভালো থাকাই জীবন।

বয়স বাড়ছে পৃথিবীর। লোভ এবং স্বার্থপরতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তিলে তিলে ঢেকে দিচ্ছে দেশের পর দেশের নীল আকাশ, বিশুদ্ধ বাতাস। জ্বালানি তেল ফুরিয়ে আসছে। প্রচন্ড তুষারপাতের দিনে আমরা আরামদায়ক একুশ ডিগ্রী তাপমাত্রায় দেশের গান শুনতে শুনতে ধোয়া ওঠানো চা খাচ্ছি। প্রতিদিনের ছোট খাটো আরাম আয়েশে আমরা কৃতার্থ নই। আমাদের শুধু চাই, আরো চাই, আরো চাই। এই ভোগ বিলাসের জন্য আমরা পৃথিবীকে করে তুলছি অস্থির। প্রকৃতি ক্ষেপে প্রতিশোধ নেবে অচিরেই। সেদিন কি আমাদের শিশুরা আমাদের ক্ষমা করবে?

রূপকথা নয় সে নয়

-আজিজ ইসলাম

মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান

মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তার প্রাণ।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইতিহাস সম্বন্ধে বলেছেন, ইতিহাস কি, মেনে নেয়া গালগল্প ছাড়া? তার সহস্র প্রমাণ আছে।

রিচার্ড এ্যাটেনবরার চলচ্চিত্র "গান্ধী"র এক দৃশ্যে নেহেরু সোহরাওয়ার্দীকে সঙ্গে নিয়ে আমরণ অনশন ধর্মঘট-ব্রতস্থ গান্ধীকে দেখতে যান। নেহেরু বলেন বাপুজি, "আমি সোহরাওয়ার্দী সাহেবকে সঙ্গে এনেছি যিনি মুসলিম জাগরণের ডাক দিয়েছিলেন, তিনি এখন তাদেরকে অস্ত্র ত্যাগ করে শান্ত হতে বলেছেন। ভেবে দেখুন, আপনি বেঁচে থেকে কী করতে পারেন যা মরে গেলে করতে পারবেন না"। ছবিতে সোহরাওয়ার্দীর কোন সংলাপ নেই।

ধরিত্রী ভট্টাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব দ্য সাউথ ইন সিওয়ানী, টেনেসিতে দক্ষিণ এশীয় ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক। তিনি এই দৃশ্যের নিহিত অর্থে বিব্রত বোধ করেন, কারণ সোহরাওয়ার্দীর পরিচয় দেয়া হয়নি, একজন প্রাদেশিক নেতাকে জগৎবাসী দূরে থাক, কতজন ভারতবাসী চিনতেন, তখন এবং স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছর পর? তিনি ছিলেন বাংলার মুখ্য মন্ত্রী। নেহেরু গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্য আর কার কাছে সাহায্যের জন্য যেতে পারতেন? তাঁর মুসলিম জাগরণের ডাক মুসলিম লীগের স্থানীয় নেতা হিসাবে তৎকালীন রাজনীতির ও পাকিস্তান দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু অস্ত্র ত্যাগ করার প্রসঙ্গ স্পষ্টত কোলকাতা দাঙ্গার সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়।

ধরিত্রী ভট্টাচার্য সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। সোহরাওয়ার্দী ডায়েরি লিখতেন না, কেউ তাঁর জীবনী লিখেনি, মহাফেজখানায় পাওয়া তথ্যে জানা যায়, ১৯২০এর দশকে খেলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীর যোগ দেয়ার সময় থেকে তাঁর সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সন্তানোচিৎ সম্পর্ক বজায় ছিল। স্বাধীনতার দুই দিন আগে তিনি গান্ধীর কোলকাতা ত্যাগ রহিত করে দুজন একত্রে বেলিয়াঘাটার হায়দারি মঞ্জিলে অবস্থান করেন। এর উপর মাউন্টব্যাটেন পরে মন্তব্য করেন "যখন পাঞ্জাবে শান্তি রক্ষার জন্য ৫০,০০০ সৈন্য মোতায়েন করতে হয়, তখন বাংলায় গান্ধী ও তাঁর সহকারী এককভাবে বাংলার শান্তি রক্ষা করেন।" তবুও তাঁর মুখ্য মন্ত্রিত্বকালে দাঙ্গা ঘটার জন্য ইতিহাস তাঁকে খালাস দেবে না। ঐতিহাসিকগণ একমত যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ক্রমে ক্রমে তার নিজস্ব গতি লাভ করে এবং যখন তা ১৯৪৬ সালের তীব্রতায় পৌঁছে তখন তা রাজনীতিকদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ধরিত্রী ভট্টাচার্য বাংলার ঐক্য সংরক্ষণে সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকাকে সর্বোচ্চে স্থান দেন। তা বর্ণনার আগে পটভূমিটা জানা প্রয়োজন। বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ পরিষদ সদস্য-গঠিত ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতের স্বাধীনতা আলোচনা করতে পাঠায়। মিশন মুসলিম লীগকে দুটি বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনা করতে দেয় (১) মুসলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিয়ে পাকিস্তান গঠন, কিন্তু হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠ এলাকাগুলি ছাড়া, (২) স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশসহ অখণ্ড ভারত, প্রদেশগুলি চাইলে অখণ্ড ভারতের অভ্যন্তরে ফেডারেশন গঠন করতে পারে। প্রাদেশিক পরিষদগুলি সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতে ভোট দিয়ে গণপরিষদ গঠন করবে যা ভারতের শাসনতন্ত্র তৈরী করবে।

দীর্ঘ আলোচনার পর মুসলিম লীগ "পোকায় খাওয়া" পাকিস্তানের পরিবর্তে অখণ্ড ভারত গ্রহণ করে। কংগ্রেস সর্বদাই অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিল।

ক্যাবিনেট মিশন জুলাই মাসে ভারত ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু ঘোষণা করলেন যে তিনি গণপরিষদে অংশগ্রহণ করা ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করেননি। সার্বভৌম গণপরিষদ ক্যাবিনেট মিশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করতে পারে। স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ ও ফেডারেশন গঠনের সম্ভাবনা খর্ব করার জন্য জিন্নাহ তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বৃটিশ সরকারের কাছে এর ব্যাখ্যা দাবি করেন। বৃটিশ সংসদ বিষয়টি আলোচনা করে কিন্তু জিন্নাহর দাবির কোন জবাব দেয় না। এতে রাজনৈতিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠে ও ভাইসরয় কংগ্রেসকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেন। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখার পরিবর্তে লীগও সরকারে যোগ দেয়। কিন্তু সংকট নিরসনের পরিবর্তে জটিলতা ধারণ করে এবং এক মাসের মধ্যে ১৬ আগষ্ট ১৯৪৬ কোলকাতার অনপনেয় কলঙ্ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক বৃন্তের দুটি ফুলকে ইতিহাসের রক্তপঙ্কে মর্দিত করে।

বৃটিশ সরকার মনস্থির চূড়ান্ত করে মাউন্টব্যাটেনকে"একক উত্তরাধিকার না পাওয়া গেলে দুই বা ততোধিক উত্তরাধিকারের হাতে" ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ভারত পাঠায়। সোহরাওয়ার্দী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করে তৎক্ষণাৎ বাংলার গভর্ণর স্যর ফ্রেডারিক বারোজকে তাঁর "বিকল্প প্রাদেশিক শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার" কথা জানান এবং ভাইসরয়কে বলেন যে ভারত বিভাগের জন্য বাংলার বিভক্তি আবশ্যিক নয়। নেহেরুর ঘোষণা-পরবর্তী রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার সময় সোরবর্দী আশংকা করেন যে বৃটিশ দিল্লীতে কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করতে পারে, এবং হুমকি দেন যে তা হলে "বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করে সমান্তরাল সরকার গঠন করবেন।"

কংগ্রেস পাঞ্জাব বিভাগে সম্মতি দিলে বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎ বসু (সুভাষ বসুর ভাই) তাঁর দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন যে তিনি বাংলায় তা হতে দিবেন না। সোহরাওয়ার্দী শরৎ বসুকে নিয়ে ১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে প্রেস কনফারেন্স ডেকে ঘোষণা করেন যে অখণ্ড বাংলা একক সত্তায় স্বাধীন থাকবে এবং হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে যোগ দেবে না। "যুক্ত বাংলা চুক্তি" শরৎ বসুর কোলকাতার বাড়িতে ২০শে মে প্রস্তুত ও দস্তখত করা হয়।

সে দিনই জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকে পাকিস্তানে যোগ না দেয়ার মূল্য হিসাবে বাংলাকে অবিভক্ত রাখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। জিন্নাহ বলেন, "আমি আনন্দিত হব। কোলকাতা ছাড়া বাংলার কী মূল্য আছে? তারা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকলেই তাদের ভাল হবে। আমি নিশ্চিত যে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রাখবে...„ একই প্রশ্ন বাংলার বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তিনি সর্বদা ঐক্যের পক্ষে, শুধু উপর থেকে কংগ্রেসের চাপ ও মুসলমানদের একগুঁয়েমির জন্য...। বাংলার কংগ্রেস কমিটি প্রদেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বাংলার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বলেন, আমরা বঙ্গভঙ্গ রদ করতে রাজনীতিতে নেমেছিলাম, আমরা এবারও বঙ্গভঙ্গ রোধ করব।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও বাংলা বিধান সভার ২৫০টি আসনের মাত্র ১১৯টি মুসলমানদের দেয়া হয়। কংগ্রেস বিধান সভায় তার দখল বজায়

রাখার জন্য এর পরিবর্তনের বিরোধিতা করে এবং মাত্র যৌথ ভোটের শর্তে অখণ্ড বাংলা সমর্থন করতে সম্মত হয়। এ দাবি ছিল অজুহাত মাত্র, কারণ সোহরাওয়ার্দী চিত্তরঞ্জন দাসের ১৯২৩ সালের "বেঙ্গল প্যাক্ট" অনুযায়ী ৫০-৫০ প্রশাসনিক ভাগাভাগি আগেই কিরণ শঙ্করকে দিয়েছিলেন। শরৎ বসু বিভাগ-বিরোধী পাকিস্তান-বিরোধী কমিটি গঠন করেন, তফসিলি হিন্দুরা তা সমর্থন করে। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন, প্রদেশ ভাগাভাগি হলে তা সম্পূর্ণভাবে হতে হবে। জিন্নাহ প্রদেশ বিভক্তির বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতারা পক্ষে ও বিপক্ষে বক্তব্য/বিবৃতির খেলতে থাকেন।

এরিক মীয়েভিল মাউন্টব্যাটেনকে ২৮শে এপ্রিল জানান, তিনি লিয়াকত আলীর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছেন যে বঙ্গ বিভাগের সম্ভাবনা ন্যূন। মাউন্টব্যাটেন ২রা মে গভর্নরকে লিখেন, তিনি জিন্নাহ ও লিয়াকত আলীকে গোপনে জানিয়েছেন যে অখণ্ড বাংলায় আপনার আস্থা দৃঢ় এবং বাংলা স্বতন্ত্র থাকলেই তা অর্জন করা সম্ভব। তিনি তাঁদেরকে আরো বলেছেন যে আগে স্বাধীনতার ভোট গ্রহণ করা হবে এবং তাঁরা সম্পূর্ণ একমত। মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে শিমলা আমন্ত্রণ করে গোপনে তাঁকে তাঁর পরিকল্পনা দেখালে নেহেরু ক্রোধে ফেটে পড়ে বলেন, এতে ভারত খণ্ডবিখণ্ড (Balkanised) হয়ে যাবে। ভারতের সেক্রেটারি অব ষ্টেট লিষ্টওয়েল এ আশঙ্কার শূন্যতা দেখিয়ে বলেন যে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ও ঐক্যের জন্য তখন বাংলায় সন্ত্রাসী আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

কংগ্রেস স্বতন্ত্র বাংলা গ্রহণ করবে না বিধায় ভাইসরয় সোহরাওয়ার্দীকে স্বতন্ত্র বাংলার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বলেন, তবে বিধান সভায় যৌথ সরকার গঠনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধা নেই। তিনি এরূপ প্রস্তাব মেধা ও গভর্ণরের সুপারিশের ভিত্তিতে বিবেচনা করবেন। গভর্ণর সোহরাওয়ার্দী ও কিরণ শঙ্করকে "এখানে এবং এখনই" অঙ্গীকার বিহীন দৃঢ় জোট গঠন করতে বলেন। উভয়েই রাজী হন। কিরণ শঙ্করের বাড়িতে ২০শে মে ৫-দফা চুক্তি তৈরী হয় যার একজন "নীরব" স্রষ্টা গভর্ণর স্বয়ং। তিনি লণ্ডনকে সতর্ক করে দেন যেন বাংলা বিভাগের ইঙ্গিত দিয়ে কিছু না বলা হয়, এবং কোন ঘোষণায় "বাংলার দুই প্রধান দল সম্প্রতি যৌথ সরকার গঠণের সিদ্ধান্ত করেছে...„ তা উল্লেখ করা হয়। সর্দার প্যাটেল ২১শে মে কিরণ শঙ্করকে কংগ্রেসের পথ অনুসরণ করতে ধমক দেন ও বলেন, অখণ্ড বাংলা একটা ফাঁদ। অমুসলমানদের বাঁচতে হলে বাংলা ভাগ করতে হবে। ২৭শে মে নেহেরু বলেন, বাংলা অখণ্ড থাকতে পারে যদি হিন্দুস্তানে যোগ দেয়। মুসলিম লীগ বলে, তার অর্থ হিন্দুর কাছে আত্মসমর্পণ। লীগ শীর্ষ কর্তারা বাংলা অবিভক্ত রাখার চুক্তির সিদ্ধান্ত জানিয়ে লেখা সোহরাওয়ার্দীর চিঠির জবাব না দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দেন যে তাঁদের সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের সমপর্যায়ে হবে। গভর্ণর ২৮শে মে মাউন্টব্যাটেনকে বলেন যে সোহরাওয়ার্দী লীগের বিরুদ্ধে যেতে রাজি যদি কিরণ শঙ্কর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়, কিন্তু তার সম্ভাবনা সামান্য। শেষ কুটো ধরার মত সোহরাওয়ার্দী ভারত বিভাগের সময় কোলকাতাকে মুক্ত নগর ঘোষণা করার দাবি করেন। ক্ষীণ আশা, বাংলার কংগ্রেস ও লীগ আর কিছুদিন একত্রে থেকে যদি ভ্রাতৃ ঐক্য দৃঢ়তর করতে পারে। গভর্ণর যুগ্ম শাসনে জোর সমর্থন দেন। তাঁর চাপে মাউন্টব্যাটেন তাঁর রিফর্ম কমিশনারকে অন্তর্বর্তী সরকারের আইন-শৃঙ্খলা মন্ত্রী প্যাটেলের কাছে কোলকাতায় ছয় মাসের জন্য যুগ্ম শাসনের প্রস্তাব পাঠান। প্যাটেল "ছয় ঘণ্টার জন্যেও নয়" বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ভারত বিভাগের নকশা ২রা জুন চূড়ান্ত করার সময় কোন বাঙ্গালী, মুসলমান বা হিন্দু, উপস্থিত ছিল না। শরৎ বসু ৮ই জুন এক বিবৃতিতে বলেন, সর্ব ভারতের খেলায় দাবার ঘুঁটি বাংলার কণ্ঠরোধ করা হয়েছে।... তাদেরকে স্বাধীনতা দিলে ফল হবে বিভাগের বিরুদ্ধে এবং স্বীয় গণপরিষদসহ অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলার পক্ষে। বিধান সভা ২০শে জুন ১২৬-৯০ ভোটে বাংলা অবিভক্ত থাকলে পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত জানায়। পশ্চিম বঙ্গের প্রতিনিধিগণ ৫৮-২১ ভোটে বিভাগের পক্ষে রায় দেয়। ফলে বিধাণ সভার ভোট ও পূর্ব বঙ্গের প্রতিনিধিদের বিভাগের বিপক্ষে দেয়া ভোট বাতিল হয়ে যায়।

উপনিবেশিক শাসনের ১৯০ বছরের মধ্যে ১৪০ বছর কোলকাতা ভারতের রাজধানী থাকা সত্বেও বাংলা থেকে নগণ্য সংখ্যক নেতার উদ্ভব হয়। মুসলমান নেতারা প্রাদেশিক পর্যায়ের ঊর্ধ্বে যেতে পারেননি, হিন্দু নেতাদের কতিপয় মাত্র উচ্চ পর্যায়ে যান। সুতরাং বাঙ্গালীরা নেতৃত্বের জন্য দিল্লী মুম্বাই এর দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যখন এই নেতারা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে, তখন সদিচ্ছা সত্বেও ভরাডুবি রোধ করা সম্ভব হয়নি। কবি যথার্থই বলেছেনঃ

সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী

রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।

ভুল সংশোধন

বন্ধন ২০১৮ *তে প্রকাশিত "কোথা থেকে এলো কোলকাতা" নিবন্ধে দাস্য সুখে হাস্য মুখে দোদুল কারিগর..... কবিতাংশে লেখক রেফারেন্স হিসবে কবির নাম উল্লেখ করেন নাই। সম্পাদনার সময় ভুলবশত রবীন্দ্রনাথের বদলে গোপীপদ চট্টপ্যাধ্যায়ের নাম ছাপা হয়েছে।অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।*

Drawing by: Nimisha

Thammi's arrival in Perth

-Aaron Saha

On Saturday 21st September, Thammi (my daddy's mummy) came to Perth from Bangladesh. My daddy and I went to receive her at the Airport. When we were waiting for Thammi, we saw few aeroplanes through the glass lookout. They were huge and beautiful. I was very excited but waited patiently for Thammi. I gave a big hug to Thammi when she came out of the arrival. Later daddy got apple juice for Thammi and me. While drinking the juice, me and Thammi waited with the bags and daddy got the car. Then we all came home happily. Mummy cooked yummy food for all of us. Rose was happy to see Thammi too. Finally, we all had family lunch. I am looking forward to celebrate Durga Pujo with Thammi this year.

Drawing by: Aaron Saha

The Creation of Maa Durga

-Promiti Sarker

The legend dates back a long, long time ago. Mahishasur was an Aushor on the earth, and he had done many great things. He was consequently blessed with the gift of immortality by the wise Lord Brahma. Now, when it became his turn to become the king of the Aushors, he dominated over everyone on the earth and in the Heaven too. Pleased with the power he now possessed, the evil Mahishasur demanded that all the Devotas leave their homes in the Heaven.

This worried the Devotas, and they went to Lord Brahma for help. He thought calmly and soon a solution came up. He explained that the powers of all the Devotas combined could create a Devi as powerful as Mahishasur, and defeat him forever.

Taking the thoughtful advice that Lord Brahma provided, the Devotas began to combine their powers. Soon after, a blinding light sparked and before them appeared a beautiful Devi – Maa Durga. She was quite extraordinary, with three eyes and ten arms. Each of the Devotas handed her a weapon for the battle - a Chakra, a dangerous Trishul, a Quiver full of arrows, a powerful Sceptre, a thunderbolt, an axe, a sword, a flaming dart, a lion to ride upon, and a pitcher. With this, Maa Durga was ready for the battle.

Maa Durga challenged Mahishasur to battle, and he confidently agreed. The fight lasted for many days with great determination and will.

However, after long hours of perseverance, Maa Durga chopped off Mahishasur's head, declaring the conclusion of the war. Maa Durga rode back proudly, and the Devotas were eternally grateful for the powerful Devi, for helping them keep their wonderful homes in the Heaven.

Sketch by: Promiti Sarker

Hanging on by threads

-Prithul Bisshay

The light seeped in through the window.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Helvi regretted setting that to his alarm noise, but it got the job done. Anyways, it was either that, or the Soviet anthem, and he didn’t want to be labelled as a slav or whatever that was. He reluctantly got up and got ready for school and put on his necklace. It was annoying, but at least he had his drawing supplies, those got him through the gauntlet that was that hell hole. Being in a world full of super powers and being powerless was one ordeal, the next was living through that.

He walked outside and was greeted by a gentle and familiar face. The crow squawked and flew down to him, landing on his shoulder. He got some birdseed and fed it to her. She flew away, leading him to a new shortcut to school. He began to walk. The walk to school was uneventful, except this time, he heard a call.

“Yo, bird tamer!” His lab partner, the guy who he was working with on with his elemental analysis project.
“Waddya’ want, G?” Helvi responded.
“What route you taking today? That isn’t the one to school.” G said back.
“Shortcut” Short and sharp reply, which Helvi was hoping would make him go away, but it only peaked G’s interest more.
“Woah, your bird shows you that?” G teleported over.
“As a matter of fact, yes”
“What’s his name?”
Helvi stared coldly. “Her, and Nibbles”
He continued walking down the shortcut Nibbles was taking him.

“Oh, sorry dude”

School was the same old, the insults and bullying all flying at him at once. This time, he noticed something off. Now it wasn’t just directed at him, but somebody else as well. He would figure it out later. Right now, he needed to get to class.

“Seeya at science, bro” G teleported to math.

There he stood, outside English, which was also his homeroom. As soon as he entered, his immediate reaction was “Hello Mr Bruno.” He fed Nibbles some more seed and sent her on her own way, to do who knows what when he is at school.

“Early again I see?” Mr Bruno said. “Helvetica, there is someone I’d like you to meet.”

God, he hated his first name. Imagine being named after a font! When Helvi focused on what Mr Bruno was saying, he got something along the lines of “powerless” and “girl”. Then, he realised what that discussion today was about. Then, he felt a bit of empathy for her. He was powerless as well, but being a girl as well? That is like going to hell every Sunday except church. Then, he saw her.

She had white eyes, with flowing white hair and pale skin. Honestly, her aesthetic was just white. She was... Helvi had no other way to put it, she was beautiful. Yet, something drew her away from him. A sense of hatred no normal person should feel towards this person, yet, he felt it.

“H-hi, my name is Reggie, how are you?”

His immediate thought was ‘Jump out the window, you can’t interact with her’, but when he tried to speak, a second, more assertive voice spoke in his head.

‘NO’

His head throbbed. What the hell was that!? He tried to speak again, but he swung his arm and almost hit her. Helvi knew this wasn’t right, what was happening? The voice spoke.

“You were never in control, the moment you let the darkness into your mind.”
People were filing into the room.
“Let your touch corrupt everything it touches. Leave No Trace”

He was on the floor. When he tried to get up, the floor split. He lost control of his body. He was going to do...something bad, but it didn’t. A gentle touch brought him back to reality. He tried to walk but the power withdrawal was too much, and he collapsed.

Now, think for a second. Imagine thinking you never had powers for all of your life, and then suddenly finding out you have the ability to destroy everything with a single touch. Imagine keeping a family

heirloom for your entire life, and realising it gave you Bi-Polar disorder. That was what Helvi was thinking. He wasn't quite sure if he had control now, or the voice was biding his time, but he didn't care. All he wanted to know is that Reggie was okay. He let the fact that a girl's name was Reggie sink in. Probably short for something like... Regional? Register? Regenerate?Wait...regenerate? Like, regeneration? The opposite of... corruption? His head started throbbing again. It made sense, why he had a hatred of Regen, and why he split the floor open, why the voice talked about corrupting everything. Then he realised he was thinking in blindness.

He tried to open his eyes, but they wouldn't budge. He heard a familiar noise. The caw of a crow, Nibbles! It must've been time to feed her! Out of the blue, he heard a dove call. Wait, a dove? Those things don't live in cities! Those are in the forest regions, why are they here all of a sudden? As he was wrapping his head around the fact, he was hearing a dove in person, he heard Regen speak.
"Are you awake?"

3 Months later...
The caw of Nibbles had confirmed the area ahead was safe. The dusty walls of the tomb had been collapsing over centuries, yet it still stood strong. Helvi and Regen explored the area ahead, while G made sure no one was behind them. Then, he saw the door. G teleported in front and tried to open it, yet it wouldn't budge. Since the magic nullifier was disabled in this area, he tried to teleport through it but just ended up bonking his head on the sandstone door. Regen and Helvi tried their abilities on the doors and, surprisingly, Regen's ability opened the door, and didn't blast everybody in a 12-metre radius into a wall like his corruption ability. The door appeared to be going back in time, as if it was already corrupted and didn't need to be anymore corrupt. The crypt inside was dark, so they lit their torches and went inside.

The inside was filled with treasures, but they didn't care for those. Instead, they wanted the writings. Anything that can document what happened to the previous era, why they didn't have powers and what wiped almost all of them out, why they had built these tombs, crypts and temples and, their overall goal, why Corruption and Regeneration existed. Helvi found a note, and scrabbled what he could read onto his notepad. It seemed to be a letter to someone. They snagged everything else that was important and headed back out the temple entrance. When the headed back to camp, he read out what he had deciphered from the scratched-out text.

"Dear S-r—
It has b-en tough, living in the temp-e, yet we have prevailed. The l-tter boy didn't come back one day, so I volunteered as t— new on-. We just hope he did- get tak-n by the ————s. He was a good —-, so we hope he at least got o-t a-iv-. Speaking of t-e ———a———, our scientists have come up with a way to combat -t. They call it, 'Powers'. It's lik- tho-e co-ic bo-ks we use- to read. It's a-azing! We are going to do a test tomorrow, I just h-pe I l-ve del-veri-g t-is me-s-ge t- — e —.
S—n-d- -e-i ——."

The writing was scratchy and it was unclear who it was sent to or who it was from. After Helvi read that out, Regen suggested she should read two notes she found. She started reading out the notes she found. It said as follows:

"*Lab entry #17,*
The tests have been going better than expected, suprisingly. -e—i volunteered for testing and so far, he is in a stable condition. We call this new power, "Equilibrium". The ability to make something to its most basic form,to erase it from existence and everything in between. ——- has described the feeling as, and I quot-, a wanton need to erase everything he sees. We are working on the psychological... effects this has on peopl-. H- c-ns-ant-y i- rep-r—d f—l-ng 'split' b——en ————e———- ——. T-i- ——- -a- ——— -o delete the Great Days, and we need that power.
Researcher Dylan ———-, signing out."

She then read out the second note she found. It was covered in bloodstains.
"*NO NO NO NO NO NO NO NO PLEASE HELP NO NO NO NO IT HURTS HURTS EVERYTHING HURTS NO NO N"*

It ended just as abruptly as it started. Helvi felt his necklace start becoming uncomfortably warm. Voice wanted-no, needed to say something, so he gave it to Nibbles. At first, even he couldn't decipher what voice was saying, but then it became clearer, although it sounded like caveman speak. It was something along the lines of "ME ME ME ME POWER ME NEED ME

NO EQUAL NOT ANYMORE ME SPILT ME YOU ME HER ME HATE ME DESTROY”

“Voice, I’ll feed you souls later, just... calm down for god’s sake.” Helvi said. Voice calmed down and allowed Helvi to put him on his neck. G, Regen and Helvi let that information sinks in before G teleported them home.

When they gave this information in to the History Researchers, they rewarded them handsomely, including a meal of a live cow to give to Voice for his soul dosage, but this time, he required more. They contacted the police and got a death row inmate. After Helvi made him “disappear”, Voice seemed sufficed, and became dormant in the necklace again. The crew began to realise how tired they were, so they all crashed at their places. Except, Helvi didn’t have a place to call home. When he told Regen this, she kinda’ looked at him for two seconds and then said “You can crash at my place tonight.” When Helvi let that set in, he was already tucked in on the couch.

The next day, high school resumed. After a goodnight sleep on something that wasn’t a bush, Helvi was feeling refreshed for once! The day at school breezed by, where everyone respected him for his actions. It was a contradiction to his start of year term at school, especially after the frenzy. That is also why he sticks close to Regen, so if he ever lost control again, she could calm him down in a way. People made jokes, saying they were “dating” and “dependant”. The second one is kind of true, but that was him. They weren’t dating anyway, they never made it serious at least. But hey, he has a school year ahead of him; he doesn’t have time to worry about romantic troubles right now.
But how the rest of the year turned out, is something else.

Digital Art by: Prithul Bisshay

Rainbow Sparkle

-Elora Galib
(Year 3)

Meet Charlotte

“MUUUUM!!” charlotte shouted. “You know you have to Charlie!” “I know” Charlie groaned. She was feeling nervous. It was Monday, the first day of school – well for her. It was actually term two and charlotte’s first day at saint Charlotte’s. She was moving to a new school. Her mum worked there as the principal and as a teacher. “Hop into the car!” said mum. Soon they were at school and Charlotte found herself at her new desk.

Next to her was a girl called Abigale. “I wonder who that is!” she thought. “Oh hi, I didn’t see you there! I’m Abigale Anderson and you are?” “Oh, I am Charlotte Summers”. “Wow! You are famous in this school. it is named after you”. The girls didn’t get to talk much as the class started. The morning whizzed by like a tornado!

Lunchtime
Briing! “Well that’s the bell for lunch” smiled Ms. Summers, Charlotte’s mum. “Off you go!” she said. The children rushed off like a herd of elephants. Charlotte picked up her lunch box and sat alone until Briing! “Playtime bell!” the children cheered.

"Hands up children! Yep, you can go, and you". Soon Charlotte stood up and her mum kindly smiled and said, "You can also go Charlie". So, Charlotte leapt up and rushed to sit on the buddy bench. The first minute passed slowly, then the second and soon twenty minutes passed.

Abigale

Suddenly a huge tall figure came up to Charlotte. "I know you. You're Abigale Anderson." "Yes, I am!" smiled Abigale as her pale face, blue eyes and blonde hair swayed in the breeze. Next to her was another figure. "Hi, I am Amy Anderson, sister of Abigale." She paused, "we live across the road from your house." "You mean house number 37?" said charlotte. "Yes!" said the sisters. "Wow! I never noticed you! Come over for a playdate on the holidays". "Yeah! that would be great". Amy jumped up and her green eyes and red ponytail flew jumped up with her too.

That was the start of their friendship. Soon the three girls formed a trio. They played together all the time during recess and at lunch. Charlotte was settling well in her school.

BFFs

Soon it was the holidays! "Are they here yet, mum?" asked Charlotte. "We just checked two minutes ago" said mum. The bell rang and Charlotte rushed to get the door. "Mum, they are here!" she told her mum as her friends from across the street walked in. The girls were very excited to see one another. "Let's make some BFF things" suggested Charlotte. Abigale and Amy both nodded.

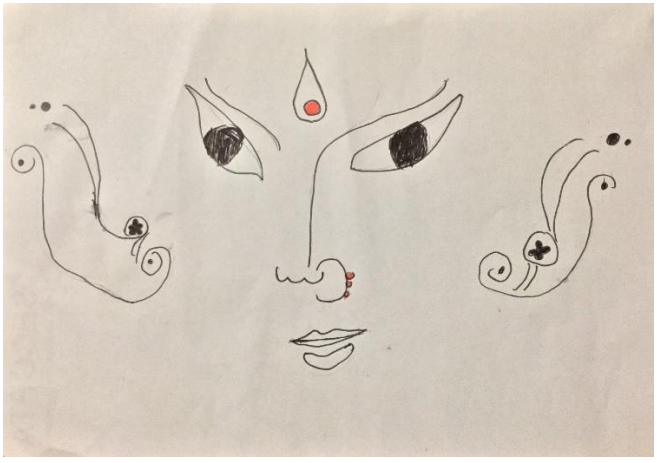

Drawing by: Joyoti Sarker

Belinda The Little Girl

-Joyoti Sarker

One day there was a little seven-year-old girl named Belinda. She had one big sister that was twenty and her name was Emily. Their parents went on holiday to Bangladesh. So, Emily had to take care of Belinda. On Monday they went to the beach. On Tuesday they stayed in the house and watched TV. On Wednesday they had McDonalds for breakfast, KFC for lunch and Hungry Jack's for dinner! On Friday they stayed in the house and played games all day. On Saturday they went to the park. On Sunday they went to the shopping centre.

The shopping centre was huge! First, they went to the Big W. Belinda was wandering around and her sister said, "Let's go to Coles!"

But Belinda took no notice. Emily thought Belinda was right behind her so she left. After a few minutes Belinda realized that she was lost.

"Where am I?" shouted Belinda. Then she had a great idea. She went to a cashier and they said, "What brings you here?

"I'm lost but there is another reason can you please phone this number 042XXXXX74"
"Sure, said the cashier but why because that's my sister's phone number."
Emily picked up the phone.
"Hello, who is it?" asked Emily.
"I'm at Big W!" shouted Belinda. Emily ran to Big W.
"Where have you been?"
"I was looking for you,"
"I was looking for you too!"
"Let's just go home,"
"Yeah, let's go,"

When they got home, they saw their parents. Their parents had gifts for them.

"Where have you been?" said their mum
"We were at the shopping centre" said Belinda

It was night time so they ate dinner, went to bed and lived happily ever after.

Western Australia's Diverse Cultural Identity

-Dr Rita Afsar[1]

Introduction

Australia's population is one of the most culturally diverse of any country in the world. According to the most recent 2016 Population and Housing Census, Indigenous Australians make up three per cent of the population. Almost half (49.3%) of Australians were either born overseas (first generation migrants) or have one (28.4%) or both parents (20.9%) who were born overseas (second generation migrants). These figures on overseas born are larger than most other countries across the world but not in comparison with some of the states within such as Western Australia (WA).[2]

With a population of 2.6 million and an area of 2.649 million km^2, Western Australia (WA) presents a special case in Australia's cultural mosaic. Its dynamic and culturally diverse population distinguishes it from the rest of Australia which is often overlooked due to the dominance of the Eastern States in the country's public discourse. The purpose of this article is to highlight the facts and features of Western Australia's changing population and cultural landscape.

Changing ratio of Australia and overseas born

Although WA comprises one-tenth of Australia's population, but the growth rate of its population has been higher than the national average. For example, between 2001 and 2006, WA population increased by 7.1% and the rate doubled (14.3%) during 2006–2011. It is estimated at 10.5% during 2011-2016. The comparative rates for Australia were 5.8%, 8.3% and 8.8%, respectively. The higher growth of Western Australian population contributes to its younger population base with the median age being 36 years, compared with 38 years for Australia. Also, it indicates that has high potential to attract migrants, business, entrepreneurs, students and investors.

Accordingly, the share of Australia born in the total WA population declined from 67.7% in 2001 to 60.3% in 2016. At the national level however, the proportion of Australia born remained almost at similar level as it was for WA in 2001 –66.7% in 2016 from 72.6% in 2001.

In contrast, the proportion of overseas born increased over time and is larger for WA than for Australia. Accordingly, overseas born comprised almost one-third (32.2%) of WA's population in 2016, an increase from 27.1% in 2001, while the national average for these periods were: 26.3% and 21.9%, respectively. The proportion of people with one or both parents born overseas is also higher in WA—53.8%.

Changing composition of migrant communities

Multicultural tapestry of WA is weaved by migrants from almost 200 countries speaking around 238 languages including Aboriginal and sign languages as well as dialects and practising over 100 faiths. Over time, migration from traditional European source countries including some main-English speaking (MES) countries such as Scotland declined, while those from Asia has increased, followed by some African countries (Figure 1). Thus, for the first time in the history of Western Australian census, migrants from non-main English speaking (NMES) countries outnumbered those from MES countries. Subsequently, ranking of the top birthplace of migrants and languages changed. For example, although England and New Zealand retained their ranking, but India emerged as the third largest birthplace replacing South Africa in 2016, while the Philippines replaced Scotland in fifth place and China replaced Italy in seventh place (Table 1).

Figure 1: Composition of migrants by regions

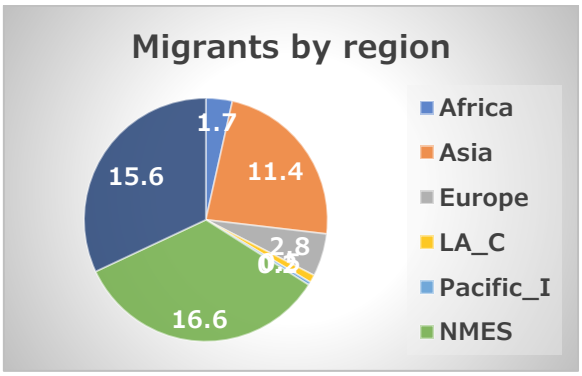

Note: LA_C= Latin America and Carribean; Pacific_I= Pacific Islanders

[1] Senior Strategy Planning and Research Officer, Office of Multicultural Interests (OMI), Department of Local Government, Sports and Cultural Industries (DLGSC). This article is prepared in her personal capacity as a researcher.

[2] Data presented here is computed and calculated from the Australian Bureau of Statistics (ABS) Population and Housing Censuses.

Source: Author's estimate from the 2016 Population and Housing Census data

Similarly, except for Italian, the top 10 languages other than English (LOTE) spoken in WA comprised Asian and African languages. Compared with 2011, two European languages—German and Spanish were replaced by Punjabi and Hindi (Figure 2). Hinduism is the fastest growing religion in WA, followed by those identified with no religion or secular beliefs, Islam and Buddhism, while those affiliated with Christianity declined gradually over time.

Compared with total WA population, there are larger proportions of adults and older people and smaller proportion of children for those from NMES countries (Figure 3).

Table 1: Changing top 10 birthplaces and languages over time

2016	2011	% Change	2016	2011	% Change
England	England	1.1	Mandarin	Italian	70.7
New Zealand	New Zealand	12	Italian	Mandarin	-6.5
India	South Africa	65.1	Vietnamese	Cantonese	22.5
South Africa	India	16.1	Cantonese	Vietnamese	7.4
Philippines	Scotland	78.9	Tagalog	Arabic	84.2
Malaysia	Malaysia	16.6	Afrikaans	Afrikaans	30.0
China	Italy	62.2	Arabic	Indonesian	18.2
Scotland	Philippines	-4.1	Punjabi	German	153.7
Italy	China	0.1	Indonesian	Tagalog	20.3
Ireland	Ireland	26.1	Hindi	Spanish	114.6

Source: Same as Figure 1

Figure 3: Age-distribution for total WA population and migrants from NMES countries

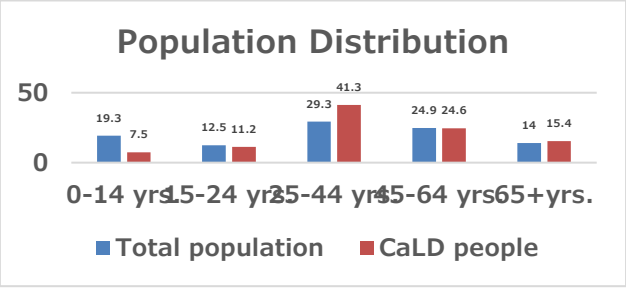

Source: Same as Figure 1

Three-quarters of Western Australians and nine in every ten migrants from NMES countries live in Metropolitan Perth and this is a consistent trend since 2011. Top 10 Local Government Areas (LGA) with largest number of migrants from NMES counties are shown in Box 1. However, as proportion of local population, Canning had the highest proportion (39.3%) of these migrants, followed by Gosnells (30.1%), Bayswater (27.2%) and Stirling (24.8%), while Joondalup the lowest (11.2%).

1. Stirling
2. Gosnells
3. Canning
4. Wanneroo
5. Swan
6. Cockburn
7. Melville
8. Bayswater
9. Joondalup
10. Armadale

Box 1: Top ten LGAs

Conclusion

Cultural diversity enriches Western Australian society and economy. It contributes to innovation, inter-connectivity between WA and migrants' home countries, creativity, greater productivity, higher economic growth, social and cultural capital.

Drawing by: Dibbo

দুটি গীতিকবিতা

-তপন বাগচী

১.

বিপদনাশিনী জগজ্জননী এসো আমাদের দ্বারে--
তুমি ছাড়া গতি নাই তাই ডাকি তোমাকেই বারেবারে॥

আমরা তোমাকে ডাকছি সবাই একসাথে ভালবেসে
তুমি চাইলেই অসুর পালাবে, শান্তি আসবে দেশে
ডাকার মতোন ডাক শুনে কেউ ঘরে কি থাকতে পারে!!

আমাদের চাওয়া খুব বেশি নয়-- থাকি যেন দুধে-ভাতে
চাই না কারোর প্রাণহানি হোক, সন্ত্রাস-সংঘাতে
সব ঘরে মিলে আজ পরিণত হোক এক পরিবারে॥

২.

এসো মা জননী ভক্তের এই হৃদয়ের মন্দিরে
সকল বছর শারদ লগনে স্মরি এই ক্ষণটিরে॥

তুমি এসে মাগো ভালো করে দাও সকল দুঃখ-জরা
তুমি এলে বহে শান্তির ধারা, শীতল হয় যে ধরা--
ভক্তের সব চাওয়া-পাওয়া থাকে তোমাকেই ঘিরে-ঘিরে॥

দেশে ছেয়ে গেছে অসুরের দলে, অশুভ চেপেছে কাঁধে
সুরের বিজয় হবেই জানি মা, তোমার আশীর্বাদে
দেশ থেকে যত বিদ্বেষ-বিষ, স্বস্তি আসবে ফিরে॥

বিবর্ণ পরিচয়

-কাজী মোহাম্মদ ইমামুল হক

ধর্ম হয়েছে সৃজন
করিতে মানবেরে বারণ
পাপ ঘৃণার তরে।

সেই ধর্ম লয়ে
চলিছে হানাহানি
যাচ্ছে রক্ত বয়ে!
হায় একি স্বভাব করিল ধারণ
মানব হইল নাশের কারণ
তাহারই স্বজাতি স্বজন!

এ কিগো সাজে
তোমায় আমায়
হেরিয়া যেথায়
পশুরাও আজি
মুখ লুকায় লাজে।

করিওনা বিবাদ ধর্ম লয়ে
বিস্মৃত হইওনা তব পরিচয়
জানিও নিশ্চয়
সব হবে লয়
একই ভূমি জল বায়ে।

ভূলিয়া যত বিভেদ
শত ঘৃণা যত খেদ
আস মিলি পরস্পরে
স্বার্থক করি মানব জনম
লভি স্বর্গ পরপারে।

Paul Tax & Accounting Services

Individual Tax Return from ***$50***

> Rental Property Tax Return

> Company, Partnership, Trust and SMSF Tax Return

> Company, Trust and SMSF set up

> Tax Planning > Small Business Setup

> GST Return > Bookkeeping Services

Contact: 0433003415

Biplab Paul
Paul Tax and Accounting Services
Registered Tax Agent and Public Accountant
Masters of Accounting (Central Queensland University)
M.Com (DU) B.Com (Hons) DU
Email: paul_biplab7@yahoo.com.au

PERTH AUTOMOTIVE SOLUTION

MOBILE MECHANIC SERVICES: WE COME TO YOU AND DO THE NECESSARY REPAIR FOR YOUR CAR.
South of the river location (Thornlie). Booking essential

For booking call NAZRUL on 0466 044 766

Or Email to: service@pasolutions.com.au

WE PROVIDE MOBILE AUTOMOTIVE MECHANIC SERVICE AT YOUR DOOR STEP FOR YOUR VEHICLE SERVICING AND MAINTENANCE NEED. PERTH AUTOMOTIVE SOLUTIONS IS WA'S LICENSED REPAIRER RUN BY QUALIFIED AND INDUSTRY EXPERIENCED ENGINEERS AND TECHNICIANS.

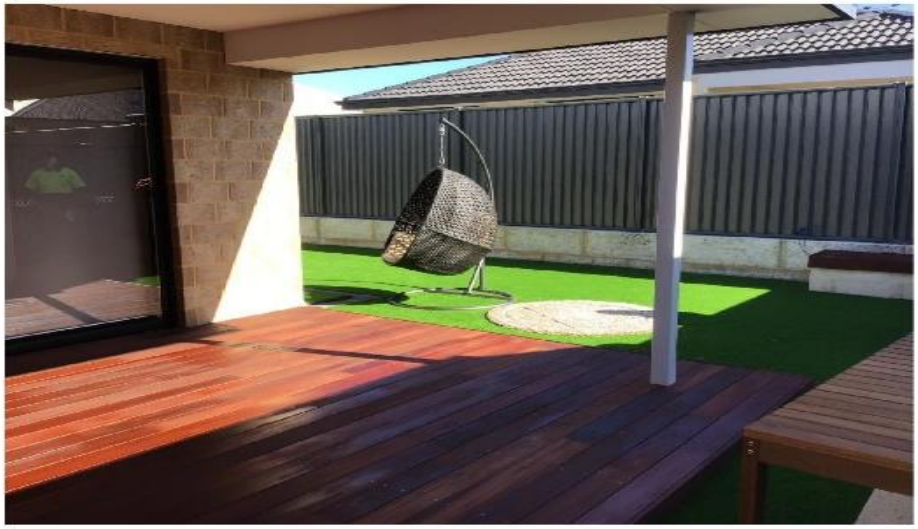

Indoor Flooring

Artificial Lawn & Landscaping

Outdoor Decking

Paving

Planter Box

WATTLE FLOORING
Unit 2 , 48 Vinnicombe Drive
0481518111
www.wattleflooring.com.au

Wattle Flooring & Outdoor Living

15 % Discount for All Bangladeshi Customer

building wealth for you

ATLAS BUSINESS SOLUTIONS

Certified Practising Accountant
SMSF Auditor

CPA
ABS is a CPA Practice

Morshed Hasan CPA
CEO

Tel : 08 9470 3560
Fax: 08 9472 0506
Email: info@atlasbusiness.com.au
www.atlasbusiness.com.au

461 Albany Highway
Victoria Park WA 6100
PO Box 26,
Parkwood WA 6147

TAX PRACTITIONERS BOARD REGISTERED

An authorised representative of Capstone Financial Planning, no: 1242658. AFSL no: 223135

Services we provide:

- Tax return preparation for companies
- Trust, Partnership, SMSF, individual
- Accounting services for business
- BAS/GST return quarterly
- Auditing of self managed superfund
- Bookkeping/payroll services
- Business tax planning
- Financial accounting and reporting
- Taxation & superannuation strategies
- Formation of new business
- Formation of SMSF
- Business name registration
- Changes of business ownership
- ABN/TFN application processing
- Investment property consultation
- Negative gearing advice

THE TAX INSTITUTE
CHARTERED TAX ADVISER

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

TAX PRACTITIONERS BOARD REGISTERED

QUALITY IS OUR MISSION .

Tax Return

From $77

- Taxation
- Accounting
- Business Services
- All Tax Returns
- Quick Refund
- Open 7Days
- After Hour Appointment Available

Please call for a free first consultation ▸▸▸

DKD ACCOUNTING

Deepok Kar CA
Principal

Office
4A Hove Court. Nollamara WA 6061
Tel: +61 8 9440 0791
Cell: +61 413 748 338
Email: deepokkar@gmail.com
deeponk@yahoo.com

© 2017 DKD Accounting. All Rights Reserved

Blue River Financial Services
Blue River Financial Services Pty Ltd
Our Lending Services
New Home Loan
Investment Loan
Refinance Home Loan
Debt Consolidation
Equity Withdrawal
SMSF Loan
Our Services are 100% FREE
CONTACT US
RAJ JOARDER
Master of Mechanical Engineering
Director/Financial Planner
Debt Advice Specialist
Mob: 0403979106
Email: raj.joarder@ampfp.com.au
WAHID KHAN
Director/Senior Financial Planner
Master of e-Business
Mob: 0433221832
Email: wahid.khan@ampfp.com.au
We receive phone calls 24/7
Web: http://www.blueriverfinancial.com.au

Express yourself with... Ananyna's COLLECTIONS
Sarees • Salwar Suits • Kurtis • Palazzos • Men's Panjabi • Jewellery • Leather Bags
Ananyna's COLLECTIONS
View by appointment only
Contact - Anu 0413 161 491
9/88 Boradway, Nedlands 6009